শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বি. এ., বি. টি.
শাস্ত্ররত্ন.

শিক্ষা-বিজ্ঞান

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী • কলিকাতা ১২

শিক্ষা-বিজ্ঞান

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী
বি.-এ., বি.-টি., শাস্ত্ররত্ন-প্রণীত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

মূল্য ৩৷০ টাকা

Published by A. C. Ghosh, M.A. Presidency Library, 15 College Square, Calcutta. Printed by A. C. Ghosh, Sree Jagadish Press, 41 Gariahat Road, Calcutta—19

নিবেদন

শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীনতার পর যে চেতনা এসেছে, তার পরিমাপ করা কঠিন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, যখন তরুণ মনের প্রস্ফুটনে বিদেশী টবের তু'লে-রাখা মাটিতে কৃত্রিম সারের প্রয়োগ ছিল বেশী, তখন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সীমা ছিল সংকীর্ণ। আর, তার মূল্য বুঝতে পারলেও শিক্ষকের ন্যায্য সমীক্ষাগারে অনেক রকমের বাধা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত সূত্র ও পন্থাগুলি এ দেশের মাটিতে পৌঁছিতে অযথা বিলম্ব হ'ত। বিনেট্-সাইমনের বুদ্ধি-পরিমাপ-প্রণালী যখন সে দেশে হয়েছে অতি পুরাতন, তখন এ দেশের দু'চারটি জিজ্ঞাসু-শিক্ষক অথবা দু'একটি আদর্শবাদী শিক্ষা-বিধায়ক তারই অনুকরণ কর্‌তে চেয়েছিলেন এই বিশাল দেশে। ওয়াট্‌সনের আচরণ-তত্ত্ব এদেশে সাড়া এনেছে মাত্র অল্প ক'বছর। শিক্ষকের বিরাট আধিপত্যের ক্ষেত্র এবং তার কর্ম-প্রণালীর শব্দহীন তরঙ্গ আজ দেশবাসী দেখ্‌তে সুরু করেছেন। তাই আজ অনেকেই বুঝতে পেরেছেন, আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল দেশের ভাব-ধারাকে ধ'রে রাখ্‌তে হবে। এখনও বহু ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ, ভাবানুবাদ অথবা সংকলন প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত এ রকমের সুলিখিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ আরও অল্প।

মনে হয়, এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচলন বেশী হ'লে আমাদের ঘরের দিকেও নজর পড়্‌বে। তা হ'লে ভাব-সমন্বয়ের জন্যে পণ্ডিত-মহলে সক্রিয়তা দেখা দিবে। ঠিক এই কারণে আমি এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য

মতবাদের কিছু কিছু অনুশীলন করবার চেষ্টা করেছি। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রচলিত বা অপ্রচলিত গ্রন্থের নাম আমার জানা নেই। তাই, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, চণ্ডী, গীতা, কালিকাতন্ত্র, সুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে মনোবিজ্ঞান-সম্পর্কিত কিছু কিছু সূত্র ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। তুলনা-মূলক এই আলোচনার প্রচেষ্টা, অন্ততঃ বাংলা ভাষায়, পূর্বে আর কোন গ্রন্থে হয়েছে কিনা, জানি না। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি এই গবেষণা-মূলক কার্যে ব্রতী হবেন।

প্রায় তিন বছর হয় বইখানা লেখা শেষ হয়েছে। মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্যে পরম-সুহৃদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ।

শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে বইখানা কিছু কিছু কাজে লাগবে বলে ভরসা করি। সাধারণ পাঠকও বইখানাকে নিতান্ত শুষ্ক ও তথ্য-কণ্টকিত ব'লে মনে করবেন, এ ধারণা আমার নেই, কারণ ভাষাকে যথা-সম্ভব প্রাঞ্জল রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন চৌধুরী

সূচীপত্র

মনোবিজ্ঞান ও জীব-জগৎ

গীতায় আছে,—

"ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥"

এর অর্থ, স্থূল দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধির পর যিনি (পরমাত্মা), তিনিই জীবের আশ্রয়। বুদ্ধির অতীত রাজ্যে প্রবেশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুদ্ধিও এমন একটা স্তরে, যেখান থেকে মন বিকল হ'য়ে ফিরে আসে। শুধু মনোরাজ্য নিয়ে, আর মনের উপাদান-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে—পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দেশে ও কালে, বিভিন্ন কৃত্রিম ও অকৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে, প্রধানতঃ জীবদেহ ও জীবের উপর দিয়ে বহু রকমের পরীক্ষা ক'রেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বৈষম্য যথেষ্ট থাক্‌লেও, কতকগুলি সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যাকে ভিত্তি ক'রে আমাদের দেশেও ঐ প্রকারের অনুশীলন করা যেতে পারে। এই সকল পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবের বিবর্তন; তা হ'লেই জীব-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে মনোবিজ্ঞান পাকা ইমারতের উপর গ'ড়ে উঠ্‌তে পার্‌বে। মেষ-শিশুর বা ছাগ-শিশুর মনোবৃত্তিগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ে মানব-শিশুর সহিত এক, কোন্ কোন্ বিষয়ে এক নয়, এদের

মধ্যে কোন বিস্ময়কর যোগসূত্র আছে কিনা, মানব-শিশুর শিক্ষা-ব্যাপারে সে সকল তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা এবং সুনিয়ন্ত্রিত, ব্যাপক পরীক্ষা আবশ্যক। এই পরীক্ষা-ক্ষেত্র থেকে উদ্ভিদ্ বাদ যায় না। বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত **মেণ্ডেল্** প্রায় এক শ' বছর পূর্বে তাজা মটর-শুঁটির বংশ-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে দীর্ঘ গবেষণা ক'রেছিলেন, তার গোড়ায় ছিল দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সাধনা। তাঁর বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তকে **"মেণ্ডেলের আইন"** ব'লে বিজ্ঞানী-মহল জানেন। আবার, বছর পঞ্চাশ পূর্বে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক **হিউগো-ডি-ভ্রীস** সন্ধ্যা-কালীন প্রিম্-রোজ পুষ্পের বংশ-বিতানকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'রে এক গ্রন্থ প্রচার করেন। উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ, মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী জীব, সরীসৃপ, জলচর, স্থলচর, খেচর—বৈজ্ঞানিকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সমীক্ষা ও পরীক্ষার হাত থেকে কেউ এড়ায় নি। জীবের, এবং প্রধানতঃ মানবের বিবর্তন—যে অলৌকিক ব্যাপার হয়েও জড়-চেতনের অভূতপূর্ব নিয়ম-সকলের অধীন, আর প্রজ্ঞাবান্ মানব যে এই তত্ত্ব-সকলের অনুশীলনে তন্ময় হ'য়ে ভবিষ্যতে মানব-শিশুর শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের পথে একে একে ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন, এ কথা আজ সবাই জানেন। এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান ও শক্তিধর মনস্বী বার্ণার্ড্ শ ব'লেছেন,—"যদি বিশ্বাস কর্‌তে হয় যে কুকুর, বিড়াল, সাপ, পাখী, গোবরের পোকা, ঝিনুকের পোকা, হাঙ্গর, কুমীর, নর ও নারী—সৃষ্টির গোড়া থেকে পৃথক্ বংশ-ধারা রক্ষা ক'রে—বিবর্তনের পথে চলেছে, তা'হলে বিবর্তন-বাদের গোড়ার কথাই ভুল হবে। জীব-জগতের এই যে বিভিন্ন শাখা, এগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন নয়; ওরা এক আদিম-কালের কোন অজ্ঞাত চেতন

পদার্থের বা জীবের বিবিধ পরিবর্তনাধীন মূর্তি, যা যুগে যুগে নূতনতর রূপপরিগ্রহ কর্‌ছে। এই প্রাথমিক প্রাণী এক বা একাধিক হ'তে পারে। যাঁরা এই সত্য স্বীকার কর্‌বেন, তাঁরাই বিবর্তনবাদের প্রকৃত মূল্য দিতে পার্‌বেন।" অপর একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, "সকল জীব সম্বন্ধে একটি সাধারণ সত্য এই যে, জীবন-প্রবাহের ফলে জীব-দেহের গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে; আমরা আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ইতিহাস নিজেদের দেহ-মান লইয়া চলি।"

মানবেতর একটি সাধারণ জীব কি ভাবে চলে, কি ভাবে বহির্জগতের সঙ্গে খাপ্ খেয়ে চলে, অথবা কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তার নিম্নস্তরের বৃত্তি-সমূহের পরিপুষ্টি সাধন করে, তার বুদ্ধি-বিকাশ, অনুভূতির অগ্রগতি এবং কর্মোদ্যম মানুষের ঐ ঐ বস্তু অপেক্ষা হীনতর হ'লেও এক-জাতীয় কি না, এ সকল প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। একটি টাট্‌কা-ফোটা মুরগীর ছানা জলে সাঁতার দিতে দিতে যদি তার ক্ষুদ্র জীবনে সর্বপ্রথম একটি কুকুর-ছানাকে পুকুর পাড়ে ঘেউ ঘেউ কর্‌তে শু'নে জলের নীচে গা ঢাকা দেয়, তবে তার এই কাজটির কি ব্যাখ্যা করা যায়? পাতলা টিন, বাঁশের বাতা কিংবা শোলার তৈরী একটা চর্‌কি, যে-দিকে হাওয়া বয়, সেইদিকে ঘোরে। এগুলি জড় বস্তু। মুরগী-ছানাও তেমনি, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার একটি পুঁটুলির মত, জড়-দ্রব্যের গতি-বিধির সাদৃশ্য রক্ষা ক'রে, কুকুর-ছানার চীৎকারে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু সত্যিই কি এ ব্যাখ্যা করা চলে? মোরগছানা তো জড় পদার্থ নয়; তার চেতনা আছে—বিচার-শক্তি হয়ত নেই। সে কি ভাব্‌তে পারে, কুকুর-জাতি তার চির-শত্রু, এই শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় জলে

ফস্ ক'রে ডুবে যাওয়া ? এ যুক্তি-ধারা আসবে মানুষের, মোরগ-ছানার নয়। অথচ **লয়েড মর্গ্যান** নামে একজন বিজ্ঞানী এ রকমের কুকুর-মোরগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা ধৈর্য ধ'রে ক'রেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল ? বলা বাহুল্য, এই নিম্নশ্রেণীর জীবদ্বয়ের ব্যবস্থা-বিশেষে আচরণ কি পরিমাণে মানুষের আচরণের দ্যোতক, তারই অনুশীলন করা। কুকুর-ছানা দেখে আর তার ডাক শু'নে মোরগ-ছানার চোখ-কাণ সজাগ হয়েছে ; তার স্নায়ু-তন্ত্রে একটা ধাক্কা লেগেছে ; তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কোষগুলিতে স্নায়ু-শক্তির প্রবাহ ছুটেছে ; তখন তার জলে-ডোবা সম্ভবপর হয়েছে। তার শারীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে (তা যত ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্টই হোক্) কতকগুলো স্তর প'ড়েছে। তার বংশ দিয়ে হেঁটে-আসা অন্ধ প্রাণ-শক্তি তার শারীর শক্তির ভিত্তি, আর তার পক্ষে যে-টুকু বহির্জগৎ, সে-টুকুই তাকে দিয়েছে তার অভিজ্ঞতার উপাদান। আবার, পুনঃ পুনঃ আচরণে এ অভিজ্ঞতার আওতা বেড়েই যাচ্ছে।

বিখ্যাত মনীষী **ড্রেভার** তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে বলেন, মুরগী-ছানার ঐ অভিজ্ঞতার (বা প্রকৃতি-গত ক্রিয়ার) তিনটি উপাদান ; **প্রেরণা, বিচার** এবং **স্বার্থবোধ**। প্রেরণা জীব-স্বভাবের সহ-ধর্মী ; যে-কোন ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত ক্রিয়ায় জীব-মাত্রেরই এই **প্রেরণা** (Conation) স্বভাব-সিদ্ধ। এর পরই আসে বহির্দৃষ্টি বা বিচার। মুরগী-ছানা যাহা কিছু করে, তাহারই প্রথম অবস্থায় একটা অনুভূতি জাগে, তারপর সে বাহিরের দিকে তাকায়, অর্থাৎ বুঝে নেবার চেষ্টা করে তার নিজের বাইরের দুনিয়াটা, আমাদের দৃষ্টান্তে কুকুর-ছানার বীর-দর্প। ওর জলে-ডোবারূপ ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে বহির্জগতের স্বীকৃতি

বা **বিচার** (Cognition)। সর্বশেষ আসে তার **স্বার্থ-সম্বিৎ ও তজ্জাত ক্রিয়া** (Effect)। মুরগী-ছানার বেলায়, আমরা দেখি, সে কেমন ক'রে যেন বুঝে নেয় যে ঐরূপ অবস্থায় প'ড়ে জলে ডুব মারাই তার পক্ষে স্বার্থ-সিদ্ধি। সুতরাং মুরগী-ছানার এই সামান্য একটু কাজের বিশ্লেষণ করলে তিনটি ধাপ বা তিনটি সূত্র পাওয়া যায়। এই তিনটি পৃথক্ হয়েও পৃথক্ নয়। তিনটিতে মিলে এক হয়ে যায়। কিন্তু ডক্‌টর ড্রেভার বলেন, নিকৃষ্ট-শ্রেণীর জীবে শেষোক্ত ব্যাপারটি, অর্থাৎ স্বার্থান্বেষণ-চেতনা কিছু কিছু বর্তমান, অপর দুইটি সম্বন্ধে তার চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় না। তিনি আরও বলেন, জীব যতই বিবর্তিত হয়ে উন্নততর শ্রেণীতে আরোহ-প্রথায় চলে, অপর দুইটি চেতনা ততই স্ফুটতর হয়।

জীব-জগতের এই সহজাত বৃত্তিসমূহের (instinct-এর) অনুশীলনে মহামনস্বী **ম্যাক্-ডুগালের** জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল শিক্ষা-জগতের পরম লাভের বস্তু। সকল জীবের, প্রধানতঃ মানুষের **সহজাত বৃত্তিগুলিকে** (instinct) তিনি চৌদ্দটি ভাগে ফেলেছেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্য অধ্যায়ে হবে। কীট, পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীদের নিয়ে বহুদিনের পরীক্ষার পর তিনি যে সব সারগর্ভ অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন, নিম্নে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত হচ্ছে।

সব জীবেরই একটা অন্ধ শক্তির প্রেরণায় **ইচ্ছা** (volition) জন্মে। মানুষ যখন একটা আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় তখন সে বল্‌তে পারে না, কি জন্য সে সচেষ্ট হয়; বড় জোর, সে বলে সে চেষ্টা না ক'রে পারে না; কে যেন তাকে ভিতর

থেকে ঠেলা মেরে চালায়। অন্যান্য জীবেরও তাই। অন্য জীবেরও মনো-গঠনে পূর্বোক্ত তিনটি শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। যে জন্ম-গত শক্তি কোন জীবকে তার পরিবেষ্টনের অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে সক্রিয় ক'রে তোলে সে শক্তি জাতি বা বংশপরম্পরায় অধিগত; তবে কোন কোন জীবের এই সহজাত শক্তি বা তদনুসৃত বৃত্তি এতটা জটিল বা স্বয়ংপুষ্ট যে সামান্য সংঘাতে তার অপচয় বা বিনাশ ঘটে। পতঙ্গ-শ্রেণীর মধ্যে বোল্‌তা এরূপ একটি জীব; এদের প্রকার-ভেদ আছে। কোন কোন বোল্‌তা প্রজাপতির পাখা-হীন শিশুকে ধরে খায়; অন্য কিছুকে উদরসাৎ করে না। আবার, কোন কোন বোল্‌তা শুধু ফড়িং ধরে, অন্য কিছুকে না। কোন কোন বোল্‌তার খাদ্য মাকড়সা। এই রকমের ভক্ষ্য জীবের অনেকগুলির মধ্যে কোন বোল্‌তাকে ছেড়ে দিলে সে নিজের রুচি অনুসারে বাছাই ক'রে নিবে। এই রুচি বোল্‌তা পেল কোথা থেকে? আর দশটা বোল্‌তাকে দেখে শিখেছে কি? —না, এটা তার বোল্‌তা-জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা? এর কোনটিই নয়। পোকা-অবস্থা থেকে যখনই খোসা-ছাড়া হয়ে পাখা গজিয়ে বেরিয়েছে, তখন থেকেই সে নিজের শিকার সন্ধান কর্‌তে লেগে গেছে। এই সন্ধান-শক্তি তার নিজস্ব; এই জ্ঞান (যদি, 'জ্ঞান' শব্দটি ওর পক্ষে প্রযোজ্য হয়) তার জন্মগত সংস্কার।

আর একটি মজার কথা এই, এক এক রকমের বোল্‌তা এক এক রকমে তার শিকারের জীবটিকে কুক্ষিগত করে। কোন বোল্‌তা তার শিকারের জীবকে কোনাচে ক'রে আক্রমণ করে, কোন বোল্‌তা তার শিকার সহ পিছুতে পিছুতে নিজের আবাসে ফেরে; তখন মনে

হয় যেন একটা মস্ত বড় জোয়ান মর্দ্দ বেঁকা-কোঁকা হ'য়ে অতি কষ্টে এক পাউণ্ড চায়ের বোঝা টান্‌ছে, অর্থাৎ বোল্‌তার ঐরূপ চলা নিতান্ত একটা অভিনয় ; সে অক্লেশে শিকারের জীবটিকে মুখে ক'রে এগিয়ে যেতে পারে, পিছু হটা তার অপূর্ব রুচি এবং স্বতঃ-প্রাপ্ত অভ্যাস। কোন কোন বোল্‌তা শিকার ধরে তার তৃতীয় পা-জোড়া দিয়ে ; কেউ বা ধরে দ্বিতীয় জোড়া দিয়ে ; কেউ কেউ মুখ বা চোয়াল দিয়ে। একই বাঁধা নিয়মে এরা চলে ; কিছুতেই অভ্যাস বদ্‌লায় না। এক শ্রেণীর বোল্‌তা তার বাসা বা চাকের নিকট অবধি শিকারটিকে টেনে আনে, এক জায়গায় রেখে দেয়, পরে মাথা বা মুখ ঘুরিয়ে নিজের গর্তে টেনে নেয়। আর এক শ্রেণীর বোল্‌তা হয়ত কোন ছোট গাছের আব্‌ডালে শিকার রেখে নিজের বাস্তুর খোঁজ করে। অপর এক জাতীয় বোল্‌তা শিকার নিয়ে সোজা নিজ আস্তানায় ঢুকে পড়ে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে ম্যাক্‌ডুগাল সাহেব এই বোল্‌তার সংস্কার-গত আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনেকে মনে করেন, বোল্‌তারা যন্ত্রবৎ ; এদের সত্তা যন্ত্রেরই অনুরূপ ; এদের সংস্কারগুলি পূর্ব-থেকে পাওয়া, যেন নূতন অবস্থায় প'ড়ে নূতন ক'রে পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল দেখেছেন, নূতন পরিবেশের মধ্যে বোল্‌তারা নিজেদের খাপ্‌ খাইয়ে চল্‌তে পারে। শিকার সন্ধানের ইচ্ছা এরা জন্ম থেকে পায়, এই ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় শিকার বাছাই করবার শক্তি ; এই দুই সূত্রের মিলনের পর সম্ভবপর হয় তার কর্ম। তার মনের গঠনে এই ত্রি-শক্তির সমবেত প্রয়োগ প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। এই নির্দ্দেশ এত কঠোর, অর্থাৎ বোল্‌তা বা তজ্জাতীয় অনেক কীট-পতঙ্গের সংস্কারগুলি এত পূর্ণাঙ্গ যে তারা

যন্ত্রবৎ অবস্থাবিশেষে নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। এদের instinct বা সহজাত সংস্কার এদের মনের চৌদ্দ আনা দখল ক'রে আছে। সেইজন্য, এরা পাখা গজাবার পরই জীবন-যাপনের সমস্ত শক্তির অধিকারী হ'য়ে—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরিপুষ্টভাবে পেয়ে—জীবনের ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেয় এবং কতকগুলি উদ্দেশ্যমূলক জটিল ক্রিয়ার সমাপ্তির পর দেহত্যাগ করে।* ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, বোল্‌তা জাতীয় প্রাণীর মন কয়েকটি জন্মগত বিচার-বুদ্ধির সমষ্টি, যার প্রত্যেকটির মূলে প্রেরণা আছে ; একটি প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণী বা পতঙ্গ তার সংকীর্ণ জীবনে এমনি কয়েকটি কাজ করে, যার ধারাবাহিকতায় প্রেরণার পর বিচার এবং বিচারের পর প্রেরণা এসে তার জীবনকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

সাধারণতঃ প্রাণীদের মনোধর্ম অবস্থা-বিপর্যয়ে রূপান্তর গ্রহণ করে। এই রূপান্তর তিন ভাবে ঘটে। কোন পাখী হয়ত প্রথমে সব রকম পতঙ্গের পিছু নেয় ; পরে কোন বিশেষ প্রকারের প্রজাপতি বা পতঙ্গকে দুর্গন্ধযুক্ত বা স্বাদহীন বোধ ক'রে তাকে বর্জন করে। তার পরে হয়ত ঐ জাতীয় পতঙ্গের বহিরঙ্গ দেখেই তাকে অখাদ্য ব'লে ছেড়ে দেয়। এই ছেড়ে দেওয়া তার মনের রূপান্তর। কোন মেষশাবক প্রথম অবস্থায় যে-কোন চলন্ত প্রাণীর পিছু নেয় ; পরে ভেড়ার দলকে চিনে নিয়ে কেবল তাদেরই সঙ্গ ধরে। ধীরে

* "The best examples of lives governed wholly by instinct are provided by some of the insects, which, emerging from the chrysalis with all their organs and capacities fully developed, straightway perform a single cycle of highly complex purposive actions, and die."

Psychology—The Study of Behaviour—W. Mcdougall, Pp. 160—61.

ধীরে সে তার জননীকে আবিষ্কার কর্‌তে শিখে ; আর কাউকে চায় না। এর থেকে অনুমান করা চলে যে এদের জন্মগত বিচার-বোধ নবতর অবস্থার পরিপেষণে, সফলতা-বিফলতা অথবা সুখ-দুঃখের অভিঘাতে নূতন নূতন অবস্থার অধীন হয়। এই হ'ল এক ভাবের রূপান্তর।

বাঘ সাধারণতঃ মানুষকে আক্রমণ কর্‌তে চায় না। কিন্তু অপর খাদ্যের অভাব ঘট্‌লে ক্ষুধার তাড়নায় যদি একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পায়, তবে তার হিংস্রবৃত্তি মানুষকে দ্বিতীয়বার অব্যাহতি দেয় না। কোন কুকুর-শাবক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখে ভয়ও করে না, পালায়ও না। কিন্তু যদি একবার অথবা একাধিক বার ছেলের দল তাকে তাড়া করে বা উত্যক্ত করে, তা'হলে সে ছেলে দেখ্‌লেই দৌড় দেয়। তখন যে-কোন একটি ছেলে তার মনে ভয়ের উদ্রেক করে। এর থেকে অনুমান করা যায়, এই সব প্রাণীর সংস্কারগত প্রেরণা নূতন অবস্থার চাপে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এই হ'ল তাদের মনোধর্মের অন্য ভাবের রূপান্তর।

আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সামুদ্রিক পাখীর (Sea-gull) আচরণে। এই পাখী জাহাজের পিছু পিছু ছুটে মানুষের উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ কর্‌তে অভ্যস্ত হয়। কখনও বা চষা ক্ষেতের উপরে উড়ে এসে পোকা-মাকড় ধ'রে খায়। এতে দেখা যায়, এদের মন শুধু সংস্কার-ধর্মের সীমায় আবদ্ধ নেই, তা এগিয়ে চলেছে বুদ্ধিমত্তার বৃহত্তর পরিধিতে, অর্থাৎ instinct থেকে intelligence-এ। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, এ হ'ল জীবের মনোধর্মের অপর এক রূপান্তর।

তাঁর সিদ্ধান্ত তাহ'লে দাঁড়াল দু'টি সংজ্ঞায়। কোন কোন জীবের **আন্তর প্রকৃতি খুব জটিলতাময়** এবং **পূর্ণাঙ্গ**, যেমন বোল্‌তা বা পতঙ্গের। আবার, কোন কোন জীবের **জন্মাধীন** বৃত্তি অশেষ প্রকার **পরিবর্তন-সাপেক্ষ**, সুতরাং **প্রথম অবস্থায় খুব জটিল বা পূর্ণাঙ্গ থাকে না**, যেমন মেরুদণ্ডী বা স্তন্যপায়ী জীবের। প্রথমোক্ত শ্রেণীর জীব নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেও না, চায়ও না। এদের জীবনের গতি-বিধি নিতান্ত বাঁধা-ধরা, চিরাভ্যস্ত অথবা জন্ম-গত স্বভাবের পুনরভিনয় মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর জীব শৈশবে লালিত ও বর্ধিত হয়ে জীবনের নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; সেইজন্য তাদের মনের গঠনে অপরের (পিতা-মাতা বা তজ্জাতীয় রক্ষয়িতার) যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। মানুষকে এই স্তরের জীব না ব'লে গত্যন্তর নেই। প্রকৃতি যেন দুই হাতে দুই রকমের খেলা খেল্‌ছেন। বিশেষ অনুধাবন করলে দেখা যায়, একের অনুবৃত্তি অপরে। অনুকরণ অপেক্ষা অনুশাসন উচ্চতম জীব—মানবকে—তার যথাযথ মূল্য দিতে চাইছে। সেই জন্যই শিশু-মনোবিজ্ঞানের এত কদর।

পশু-মনের সন্ধান কর্‌বার উদ্দেশ্য মানব-শিশু-মনের বিশ্লেষণ। কতকগুলি সহজাত বৃত্তি, যেমন ভয়, যৌন-সম্ভোগ এবং ঘৃণা বা সংকোচ অন্য জীব ও মানুষে সমানভাবে দেখা যায়। অন্য জীবের বেলায় এ সকল বৃত্তি বা সংস্কার জটিলতা-বর্জিত এবং অভ্রান্ত। মানুষের বৃত্তি বা সংস্কার তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এতই পরিবর্তিত হয় এবং কখনও কখনও নূতন পরিবেশের চাপে এতটা সংযত হয় যে মানুষের সহজাত সংস্কারকে ভিন্ন-শ্রেণীর ব'লে ভ্রম হ'তে পারে। কিন্তু, আসলে মানুষ ও ইতর প্রাণীর মনোধর্মের ভিত্তি এক, প্রগতি

ভিন্ন। উভয়েরই ব্যবহারে অর্থাৎ আচরণে উদ্দেশ্যমূলক প্রেরণা (purposiveness), নির্বাচনপ্রিয়তা বা বহির্জগতের অভিজ্ঞতা (selectivity) এবং পরিবেশাধীন প্রতিক্রিয়া (adaptation through experience) সমভাবে বিদ্যমান। বিবর্তিত জীবের ধাপে ধাপে এই সকল মানস সম্পদের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া প্রমাণিত হ'য়েছে। মনোগঠনের প্রকারভেদ অপেক্ষা পরিমিতি-ভেদ মান্‌লে মানব-মনকে পশু-মনের উন্নততম সংস্কার বল্‌তেই হবে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, প্রগতিশীল বিবর্তন প্রধানতঃ মানস বিকাশ, দেহ-যন্ত্রের পরিবর্তন আনুষঙ্গিক মাত্র।* স্তন্যপায়ী প্রাণীকে যদি আহারান্বেষণে জলে থাক্‌তে হয়, তাহ'লে তার জলচর মৎস্যের জীবন-ধারণের অনুকূল দেহেন্দ্রিয় পেতে হয়, তাতেই জন্ম হয় কুমীর বা শুশুকের। সরীসৃপকে আকাশে উড়তে হলে তার চাই পাখা, অনেকটা পাখীর ডানার মত। জলচর জন্তু যখন স্থলভাগে বাস করতে বাধ্য হয়, তখন তার পাখ্‌না বদলে হয় ফুস্‌ফুস্। জীবন-যাপনের তাগিদে মনের তাগিদ; মনের তাগিদে দেহের রূপান্তর। অবশ্য, বহু যুগ ধরে এই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। আবাসের পরিবর্তনে রং-এর বদলও ঘটে। কথা পশু ও মানবের বেলায় একই। সুতরাং মনস্তত্ত্বের আলোচনায় জীব-তত্ত্ব (biology) এসে পড়ে। সে সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা স্থানান্তরে হবে।

যে দিক্ দিয়েই দেখিনা কেন, জীব-মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথা বিবর্তন। বিবর্তন-বাদের সম্যক্ আলোচনায় উদ্ভিদ্ ও জীবের জীবন-প্রবাহের পরীক্ষা।

* Progressive evolution has been primarily an evolution of mental structure and only secondarily one of bodily structure. Ibid P. 174

মনের উপাদান

উদ্ভিদ্ ও অন্য জীবের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার প্রধান সার্থকতা মানব-মনের পরীক্ষা, তার শৈশব থেকে শেষ কাল পর্যন্ত, নিগ্রো থেকে সভ্যতম মানব পর্যন্ত। মনের প্রধান ধর্ম রক্ষণশীলতা। জীব ও মানবের পূর্বগামিগণের প্রকৃতি পরবর্তিগণের মধ্যে নিঃসৃত হয়। শুধু স্মৃতি থাকে। এই স্মৃতিধারাকে মনের প্রধান একটি উপাদান বল্‌তে হবে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। আজ যদি কারও কোন বিশেষ দিনের রেল-ভ্রমণের কথা মনে পড়ে, তাহ'লে তার সেইদিনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি তার মনের দৃশ্যপটে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে ; সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাটি সঞ্চিত আছে ব'লেই আজ তার রেল-ভ্রমণ মনে করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু এখানে একটি গুরুতর বিষয় লক্ষ্য কর্‌তে হবে। যে-টুকু তার আজ মনে পড়্‌ছে, তা তার সংরক্ষিত স্মৃতি-ভাণ্ডারের সামান্য অংশ মাত্র। আর একটি দৃষ্টান্ত বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট কর্‌বে। যখন কেউ তার মাতৃভাষায় লেখা কোন বই পড়ে, তখন বর্ণগুলির, শব্দগুলির, বাক্যগুলির ধারাবাহিক অবরোধ তার দরকার হয় না ; পূর্বের অভ্যস্ত কথাগুলির অর্থকে অন্ধকার রাজ্য থেকে টেনে আন্‌তে হয় না। অথচ, একথা ঠিক, তার মনের গোপনতলায় স্মৃতিধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই স্মৃতিধারাকে বিখ্যাত শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ **সার্ পার্‌সি নান্** ইংরেজিতে নাম দিয়েছেন—"mneme"। মানুষের বেলায় এই স্মৃতির খেলা তার

চেতনা-সম্ভূত ; কিন্তু অতি নিকৃষ্ট জীবেও এই স্মৃতিধারার প্রমাণ বিশেষজ্ঞগণ পেয়েছেন। একজন বিজ্ঞানী ইংরেজি অক্ষর Y-এর আকারে একটি নল (ফাঁপা) তৈরী করিয়ে তার মধ্যে একটি কৃমি বা কেঁচোকে ছেড়ে দিয়েছেন। কেঁচোটা নীচ থেকে উপরে উঠতে গিয়ে ইচ্ছামত ডাইনে বা বাঁয়ে চলেছে। কিন্তু পরে বৈদ্যুত শক্তির আঘাত এক বাহুতে করার ফলে কেঁচোটা সেই বাহুর রাস্তা পরিত্যাগ ক'রেছে। প্রায় এক শ' বার এইভাবে পরীক্ষা করার পর তিনি দেখেছেন, কৃমি বা কেঁচো সেই বাহু দিয়ে চ'লেছে যেখানে তাকে কোন আঘাত পেতে হয় না। কেঁচোটার, মানুষের মত, সঞ্চিত স্মৃতিধারা না থাক্‌লেও, বোঝা যায় যে তার অভিজ্ঞতা অনেকখানি স্মৃতির উপর নির্ভর করে।

পশুদের মনের নিম্নস্তরে যদি সমস্ত জাতির অতীত ইতিহাস বিন্যস্ত না থাক্‌ত, তাহ'লে তাদের আচরণে বৈষম্য দেখা যেত। এও স্মৃতি-সংরক্ষণের ব্যাপার। কুকুর শোওয়ার আগে কয়েকবার ঘুর্‌পাক খায়, পাখীদের শ্রেণীবিশেষ একই ধরণে বাসা নির্মাণ করে ; তিমি-জাতীয় মাছ আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে ডিম পাড়ে। সুতরাং পশু বা মানবমনের এই স্মৃতি-সংরক্ষণশীলতা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। পশু বা মানব, জীবনে যে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্য দিয়ে চলে, স্মৃতিধারা বল্‌তে তা বুঝায় না ; জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার-ঘর থেকে ফিরে আসে না ; ফিরে আসে তার ফল বা পরিশিষ্ট। শারীর-শাস্ত্রে বলে, এক একটি অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে পরিবর্তন ঘটে। কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ হয়। স্মৃতি-সংরক্ষণের এই

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে **স্যর্ পারসি নান্** নাম দিয়েছেন—Engram, যাকে বাংলায় বলা যায়—**মনের স্মৃতি-সংরক্ষণী শক্তি**।

মনের অপর একটি ধর্ম স্বাভাবিক প্রেরণা। মনের এই সক্রিয়তা ভিতরের তাগিদ থেকে ঘটে। একে বলা উচিত বেঁচে থাক্‌বার তাগিদ। নান্ সাহেব লিখেছেন, মানুষ বা উন্নতশ্রেণীর পশু সজ্ঞানে এই প্রেরণার বলে চলে। আবার, নিম্নশ্রেণীর জীব যেন কোন এক চেতনাতীত শক্তির আহ্বানে ক্রিয়াশীল হয়। মনের এই মহামূল্য বৃত্তিকে নান্ সাহেব নাম দিয়েছেন—horme, অর্থাৎ "**এষণা**"। * আমরা পূর্বে দেখেছি, **প্রেরণা** (conation) মনের একটি ধর্ম। রস্ সাহেব বলেন, "এষণা" "প্রেরণা"-কথাটির চাইতে ব্যাপক ; এর মূলে প্রাণ-শক্তি। † ল্যামার্ক্, বার্গ্‌সঁ, বার্ণার্ড্ শ—সকলেই এই প্রাণশক্তির মূল্য দিয়েছেন। উদ্ভিজ্জগতে দেখা যায়, কোন কোন গাছের আগা ছিঁড়ে ফেল্‌লে পাশ দিয়ে ডগা বেরিয়ে ঐ স্থান পূরণ করে। টিক্‌টিকির লেজ্ ছিঁড়ে গেলে, নূতন লেজ গজায়। আমাদের রক্তপ্রবাহ, শ্বাস-ক্রিয়া, পরিপাক-শক্তি, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এ সব শারীরিক ব্যাপার হ'লেও—'এষণার' অর্থাৎ জীবনীশক্তির ক্ষেত্র। প্রখর আলোতে আমরা চোখ বন্ধ করি অথবা মিট্-মিট্ ক'রে তাকাই ; কেউ ঘুষি মার্‌তে এ'লে মাথা নীচু ক'রে ফেলি ; অজ্ঞাতসারেই এসব ক'রে বসি। এর মূলে 'এষণা', মনের একটি প্রধান উপাদান।

* "এষণা"-নামক সংজ্ঞা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শিক্ষাতত্ত্ব" হইতে গৃহীত।

† Just as 'mneme' is a much wider term than memory, so is 'horme' wider than conation.' *Groundwork of Education Psychology* by James S. Ross P. 47

স্মৃতিধারা (mneme) ও প্রাণশক্তি (horme)—মনের গঠনে দুই প্রধান ও পৃথক্ উপাদান হ'লেও—মানস ক্রিয়ায় যুক্তভাবে অবস্থিত। এ দুয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা ও সহযোগ না থাকলে কোন মানস ব্যাপার চলতে পারে না। আলোচনার জন্য আমরা পৃথক্ ক'রে দেখি, কিন্তু এই দুই মানস-শক্তির একীকরণ স্বভাব-নির্দিষ্ট। দৈহিক ক্রিয়ার অন্তরালে মন, মনের বিকাশ দেহের মাধ্যমে। সুতরাং মনের গঠনে আমরা প্রকৃতপক্ষে দেহ-মনের একটি সুসমঞ্জস অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। এই সমীকরণ সম্বন্ধে অনেক আলোচ্য বিষয় আছে।

জীব-বিজ্ঞানের সূত্র ধ'রে এবং বিবর্তন-বাদকে স্বীকার ক'রে—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাচার্য **জেম্‌স্** অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, মানুষের চেতনার প্রবাহের (stream of consciousness) দু'টি কাজ, একটি জ্ঞানার্জন, অপরটি কর্ম। সমস্ত প্রাচীন-পন্থীরা অখণ্ড, অনন্ত সত্যের উপলব্ধিকেই, অর্থাৎ অধ্যাসময় জীবনকেই (theoretic life) মানবজীবনের একমাত্র কাম্য মনে করতেন; কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর আরম্ভ থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের ধারণা বদ্‌লে যায়। তাই তিনি তাঁর শিক্ষা-ব্রতেচ্ছু ছাত্রগণকে ব'লেছেন—"আমি তোমাদের কাছে বল্‌তে চাই, মানুষ আর যাই হোক্, সে কর্মব্রত জীব (practical being); মানুষের মনের সৃষ্টি হয়েছে—তাকে জাগতিক গতির সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে নিতে।" স্মৃতিভারাক্রান্ত ক'রে মনকে উদাসী স্বপ্নপ্রয়াসী হ'তে না দিয়ে তাকে ব্রতনিষ্ঠ ও কর্মপ্রসূ ক'রে তোলা হবে নব-শতাব্দীর শিক্ষা-গুরুর নব অবদান। দার্শনিক পণ্ডিতের ভাবে নয়, শিক্ষা-গুরু হিসেবে তিনিই প্রথমে বলেছেন,

মানুষের 'স্মৃতি-শক্তি' ব'লে যে মানস উপাদান আছে, তা একটিমাত্র নয়, অর্থাৎ এক শিক্ষণীয় বিষয়ে এই শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হ'লে—অন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে সেই শক্তি পরিবাহিত হবে, এমন নয়। নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার উত্তাপে স্মৃতি-শক্তির বুদ্‌বুদ্‌ ভেসে ওঠে। স্মৃতি-শক্তির একটি বড় ধর্ম এই, কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন ক'রে কোন ব্যক্তির সজাগ মন অনেকগুলো আনুষঙ্গিক বিষয়ের পঞ্জীগঠন করে। এই স্মারক পঞ্জীকে ইংরেজিতে Association of ideas বলা হয়। এই স্মারক ভাবগুলির বা অভিজ্ঞতা-সমবায়ের জাল-বুনানি যার যত ঘন ও সূক্ষ্ম হবে, তার সেই বিষয়-বিশেষের স্মৃতি-শক্তি তত পুষ্ট ও নির্দোষ হবে। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক্‌। কোন একটি স্কুলের ছাত্র হয়ত তার ক্লাসের পড়ায় দিগ্‌গজ; অথচ খেলা-ধূলার খবর তার নখ-দর্পণে। কবে কোন্‌ খেলোয়াড়ের দল হেরেছে, জিতেছে, তা তার মুখস্থ। এর কারণ, সে তার মনে ঐগুলি নিয়ে অবিরত আলোচনা করেছে, আল্‌গা-ভাবে নয়, সূত্র-নিবদ্ধ ভাবে। আমরা দেখতে পাই, ব্যবসায়ীরা জিনিষের দর ও তার ওঠা-নামা একরকম মুখস্থ ক'রেই রাখে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ভোট্‌-গুণ্‌তিতে সিদ্ধহস্ত। সেইজন্য জেম্‌স্‌ সাহেব ব'লেছেন, "We have not so much a faculty of memory as many faculties of memory." পরবর্তী পণ্ডিতগণ বলেন, স্মৃতি-শক্তি-সম্পর্কিত এই স্মারক-সমবায় বা Association of ideas—বিজ্ঞান-সম্মত নয়। তাঁরা বলেন, এক একটি খণ্ডিত অভিজ্ঞতার পরবর্তী অবশেষ (engram)-সমীকৃত হ'য়ে—মনের ভিতরে নব-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয়; এই সঞ্চিত ধারণা-

সমূহকে কোন ব্যক্তি মালার মত ক'রে গেঁথে নেয়, এই যুক্তি ছিল জেম্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের। পরে **হার্বার্ট, নান্, রস্**—এঁরা ঐ যুক্তি বর্জন করেছেন। হার্বার্ট্ (Herbart) এই সমীকৃত স্মারকবস্তু-সমূহের পিণ্ডকে নাম দিয়েছিলেন—'Apperception masses'। নান্ (Nunn) নাম দিয়েছেন—'Engram complexes', অর্থাৎ **প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়**। কোন বাড়ীতে ঝাঁটা, সাবান ও ব্রুস্ হস্তে একটি স্ত্রীলোক ঝাড়ু দিতে আসে ; বাড়ীর বিড়ালটা প্রথমে ওর সঙ্গে ভাব কর্‌তে যায়, ও মেয়েলোকটির গা-ঘেঁসে আবদার বা মজা করতে চায়। কিন্তু সে মেয়েলোকটি সম্মার্জনী-প্রয়োগে বিড়ালের আবদার ঘুচিয়ে দিল। সেই থেকে বিড়াল,ঝাড়ুদারণীকে দেখ্‌বামাত্র বন্দীর মত এক কোণায় লুকিয়ে থাক্‌ত ভয়ে অথবা ক্রোধে। বিড়ালের মনে বিশ্বাস, ঝাড়ুদারণীর চেহারা, তার কণ্ঠস্বর, বিড়ালের নিজের শরীরের ব্যথা, ভয় ও রাগ—একসঙ্গে সমীকৃত হয়েছে। এর পরে হয়ত মেয়েটার শুধু কণ্ঠস্বর অথবা শুধু আবির্ভাবই বিড়ালকে ভয়ে সঙ্কুচিত কিংবা ক্রোধে উত্তেজিত করত ; তার গায়ের লোম ফুলে উঠ্‌ত। সব অবস্থা বা স্মারক ঘটনাগুলি একত্র না হ'লেও চল্‌ত। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই বিড়ালের মনের মধ্যে 'প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়' সংঘটিত হয়ে—তার স্বার্থ-বোধ, অর্থাৎ আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তিকে জাগ্রত ক'রেছে। অধ্যাপক **ষ্টাউট্** (Stout) প্রমাণ ক'রেছেন,—এই প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়ের মূল কারণ কতকগুলি ব্যাপার, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার শুধু পারম্পর্য নয়, কোন জীব বা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবোধের অভিঘাত (not contiguity, but continuity of interest)।

সুতরাং মনের একটি বড় উপাদান—এই **সমীকরণ-প্রবৃত্তি** (cohesion)। শিক্ষা-ব্যাপারে এর প্রভাব কতখানি—দেখা যাক্। এইমাত্র উল্লিখিত বিড়ালের মনঃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে। সবার আগে বিড়ালটার ইচ্ছা ছিল—ঝাঁটা-গাছটার সঙ্গে খেলা করা। সে হয়ত ভেবেছিল—এই স্বতঃস্ফূর্ত খেলার প্রবৃত্তি তার আনন্দবহ স্বার্থ। তার এই প্রবৃত্তি প্রাথমিক। কিন্তু পরে ঐ প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটল। ক্রীড়া-প্রবৃত্তির বদলে হিংসা-বৃত্তি জাগ্‌ল। সে পারে তো ঝাড়ুদারণীকে কামড়ে দেয়। তখন তার স্বার্থবোধের অর্থ ভিন্নরূপ ধারণ ক'রেছে। প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা মানস প্রকৃতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ'ল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কোন একটি বিশেষ অবস্থার (situation) ব্যাখ্যা বা অর্থ-বোধ (অবশ্য, জীব বা মানবের স্বার্থ-বোধের সঙ্গে একীভূত কিংবা সমীকৃত)—সেই অবস্থার মধ্যে নিহিত নয়; সে অর্থ-বোধের আস্তানা মনে। এই মন, তা কোন জীবের বা মানবের হোক্ না কেন, অবস্থা-বিশেষকে গ্রহণ করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়। সারা জীবন ভ'রে এইভাবে অবস্থা বা ঘটনা-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'রে মনের মধ্যে পরিবর্তিত এবং জটিলতর প্রবৃত্তির পলিমাটি পড়্‌তে থাকে। হাতের কাজ (skill) বা মাথার কাজ (learning) এই একই নিয়মে চলে। জীব ও মানুষের মন সাড়া দিয়ে ওঠে—যখনই তার স্মৃতিভূমিতে নূতন স্তর বিন্যস্ত হয়, যার ফলে মনের বহিঃ-প্রকাশ, অর্থাৎ তজ্জাত ক্রিয়া সহজ স্বাভাবিক এবং অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। এর মূলে মনের সমীকরণ-প্রবৃত্তি। আরও সহজ ভাষায় বলা যায়—অভ্যাস। অভ্যাসে সব কাজ স্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে।

পূর্বোক্ত সমীকরণ-প্রবৃত্তি বা cohesion শিক্ষা-ব্যাপারে অভিনবরূপে প্রকাশ পায়। কি হাতের কাজে, কি মাথার কাজে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্‌বার মত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম পেলে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সমীকরণে অর্থাৎ অভ্যাসে বিশেষ সাহায্য পায়। পঠিত বা অভ্যস্ত বিষয়ের consolidation (সংস্থিতি) মনের অভ্যন্তরে—বহিশ্চেতনার অন্তরালে হ'তেই থাকে। শিক্ষার্থী যখন অবসর পায়, এমন কি যখন নিদ্রিত থাকে, তখন হয়ত সহসা তার কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান হ'য়ে যায়। যদি তার বিষয়টিতে সত্যিকারের আগ্রহ থাকে, যদি তাতে তার স্বার্থবোধ বা আত্মতৃপ্তি অব্যাহত হয়, তা'হলে তার মনের তলায় স্মৃতির অবশেষগুলি (engrams) স্বভাবতঃ সংবদ্ধ, সংস্থিত এবং নব-গঠনে বিন্যস্ত হ'তে থাকে, কিন্তু একটি মজার ব্যাপার এই যে—হয়ত শিক্ষার্থী তখন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ ক'রে ব'সে আছে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—"We learn to skate in summer and swim in winter," অর্থাৎ আমরা গ্রীষ্মকালে বরফের উপর চাকা-খেলা কর্‌তে এবং শীতকালে সাঁতার দিতে শিখি। এ যেন শীতকালে মশারি তৈরী করা আর গরমকালে লেপ তৈরী করার মত। কথাটির গূঢ় অর্থ এই, অনেক সময়ে অবসরকালে পূর্ব-পঠিত বিষয়ে নূতন আলোকপাত হয়। ডক্টর ব্যালার্ড পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, কোন কবিতা টাট্‌কা মুখস্থ ক'রে যতটা মনে রাখা যায়, ঠিক দু'দিন বাদে আরও ভাল মুখস্থ হয়ে যায়। তাঁর এ অভিজ্ঞতা অধ্যাপন-কালে হয়েছে। একটি সাধারণ বিষয় আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করি। কোন লোক বা কোন কিছুর নাম হয়ত কিছুতেই মনে পড়ছে না। যে

সময়ে দরকার তখন কিছুতেই মনে পড়বে না ; পড়বে অন্য সময়ে যখন মন সে ধার দিয়েই যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে এই—ঠিক যে-সময়ে প্রথমে নামটি স্মরণ করতে বসেছি, তখনকার উদ্যমে মনের অন্তরালস্থিত স্মৃত্যবশেষগুলি (engrams) উত্তেজিত এবং ক্রিয়াশীল হয়েই রয়েছে ; যখন আমার মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত, তখনও সেইগুলির সমীকরণ, সংস্থিতি এবং পুনর্গঠন চল্‌ছে। যখন এই পুনর্গঠন বা সমীকরণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, ঠিক তখনই সেই হারান নামটি বহিশ্চেতনায় অর্থাৎ স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ছাত্ররা হয়ত দেখেছেন, কোন একটি বিষয় মনে প'ড়ে প'ড়েও পড়ছে না। এর অর্থ খেলোয়াড়ের ভাষায় বলা যায়, তার মনের engram-গুলি (অবশ্য সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত) তখনও তাদের খেলার semi-final অবস্থায় আছে। অধ্যাপক **রস্‌** (Ross) তাঁর এক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর এক ছাত্র গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে কোন সমাধান না করতেই শুয়ে পড়ে। শেষ রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং আশ্চর্য ব্যাপার এই, তার এত সাধনার প্রশ্নটির সঠিক উত্তর সে ঘুমের মধ্যেই পেয়ে গেছে। এখানে বলা চলে যে (রস্‌ সাহেবের নিজের উক্তি)—ঐ বিষয়-সম্পৃক্ত স্মৃত্যবশেষগুলি এতটা সক্রিয় ছিল এবং আত্মপ্রকাশের জন্য এতই উন্মুখ হ'য়ে ছিল যে, বেচারীর নেহাৎ প্রয়োজনীয় নিদ্রারও ব্যাঘাত জন্মিয়ে দিল।

রস্‌ সাহেব এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, কোন রচনা রয়ে সয়ে লেখা ভাল। রচনার বিষয়টিকে মনের মধ্যে সিদ্ধ হ'তে দেওয়া উচিত। ঐ নিয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখা দরকার। সংশ্লিষ্ট

পুস্তকাদি পড়া দরকার। তবেই লিখ্‌তে বস্‌লে, রচনাটি সুন্দর ও সারগর্ভ হবে। ইতিমধ্যে 'স্মৃত্যুপস্থাপন' হয়ে গেছে ; কাজেই রচনার বিষয়টি রচয়িতার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কোন নূতন বক্তার পক্ষে—বক্তৃতার বিষয়টি আগে থেকে লিখে রাখা ভাল, অন্ততঃ মূল সূত্রগুলি (points) ; কিছুটা সময় নিলে এবং বক্তৃতা দেবার বেলায় পাণ্ডুলিপি না প'ড়ে মুখে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে—প্রভাব-বিস্তার হয় বেশী। শিক্ষাব্রতী রস্—নূতন শিক্ষককে হতাশ হ'তে নিষেধ ক'রেছেন। কোন শ্রেণীর ছেলেরা যদি আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারে, তা'হলে কিছুটা সময় দিতে হবে। সেই সময়ের মধ্যে ঐ ছেলেদের পঠিতব্য বিষয়ের 'স্মৃত্যুপস্থাপন' হ'য়ে যাবে। যা'দেরকে অপদার্থ ব'লে মনে হচ্ছে, তারা অপদার্থ নয়, এই জিনিসই প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রমাণিত হবে অকস্মাৎ—সবারই চমক্ লাগিয়ে। মনো-বিজ্ঞানের এই রহস্যটি বিস্ময়কর। কোন কৌশলের কাজে (skill) যতই অভ্যাস পরিপক্ব হয়, ততই অসঙ্গত ও অসংলগ্ন ক্রিয়াগুলি অপগত হয় ; সঙ্গত ও সংলগ্ন ক্রিয়াগুলি সমীকৃত হ'তে থাকে ; এই শ্রেণী-বিন্যাস (sorting) এবং একীকরণ (consolidation) পূর্ণভাবে সম্পন্ন হ'লে—কৌশলের কাজটি কর্তার অধিগত হয়। এর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অধ্যাপক রস্ মনো-বিজ্ঞানী থর্নডাইক্ সাহেবের একটি পরীক্ষার উল্লেখ ক'রেছেন। একটি খাঁচায় আবদ্ধ বিড়ালের সাম্‌নে কিছু লোভনীয় খাদ্য রাখা হয়। খাঁচা থেকে বেরুবার পথও ছিল, তবে তার সঙ্কেতটি বিড়ালকে বের কর্‌তে বেগ পেতে হয়েছিল অনেক। সে প্রথম অবস্থায় লেজ ফুলিয়ে

গোঙ্‌রাতে গোঙ্‌রাতে খাঁচার ঘেরার ভিতর ঘুরতে লাগ্‌ল; এ দরজা সে দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে—অনেক উদ্যম, অনেক ভ্রান্তির পর বেরুবার সঙ্কেতটি পেল। তখন তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল। ঐ বিড়ালটিকে একই ধরণের পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ ফেলা হয়; কিন্তু দেখা গেছে, পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে বিড়াল মোটেই না গর্জিয়ে, দৌড়্-ঝাঁপ্ না ক'রে পূর্বের ভ্রান্ত সংস্কারগুলিকে অনায়াসে বর্জন ক'রে সুপরিচিত দরজাটি অক্লেশে খু'লে খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে প'ড়েছে। বিড়ালের এই অভ্যাস-সমষ্টিতে বর্জনীয় অংশগুলি ক্রমশঃ ঝ'রে পড়েছে; বাকীগুলি সময়মত সুসংবদ্ধ হ'য়েছে। এখানে তার এই দৈহিক কাজে মনো-ব্যাপারের অন্তঃফল্গু সমভাবেই প্রবাহিত ছিল।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, মনের মোটা নাড়ী দু'টি, প্রেরণা ও স্মৃতি। দু'য়ের কোনটিই ছোট নয়। এই দু'টি নিয়েই চৈতন্য-প্রবাহ (stream of consciousness) চলে। "Unconscious" বা অব-চেতন রাজ্যের অধিবাসীও আমরা। এই দুই রাজ্যে সেতু-নির্মাণ ক'রেছেন—ফ্রয়েড্, ইউং প্রভৃতি। সে আলোচনা অন্য অধ্যায়ে হবে। তবে 'প্রেরণা' ও 'স্মৃতি'—অর্থাৎ 'horme' ও 'mneme'—জীবের স্বভাব-ধর্ম হ'লে, স্বভাবজ সংস্কার বা instinct-এর প্রসঙ্গ অনিবার্য। এই স্বভাবজ সংস্কারের পরিণতি 'Intelligence'-এ (বুদ্ধিমত্তায়)। পরের অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে।

সংস্কার ও বুদ্ধিমত্তা

Instinct বা সহজাত সংস্কারকে সংজ্ঞা-ভুক্ত কর্‌বার আগে বিষয়টির গোড়ার কথায় যাওয়া দরকার। নান্‌ বলেছেন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের পূর্ব-সংস্করণগুলিতে এই সংস্কারকে বলা হয়েছে "innate determining tendencies", অর্থাৎ জন্মগত প্রেরণা। এই প্রেরণা জীব ও মানবকে তার আচরণে প্ররোচিত করে এবং আচরণকে অধিগত করে ; পক্ষান্তরে—জীবনের অভিজ্ঞতার সংঘাতে এই সহজাত সংস্কার নূতন পথে ধাবিত হয় এবং অবস্থার অধিগত হয়। আমি হয়ত কোন মাঠে একলা বেড়াচ্ছি ; পেছন ফিরে দেখি একটা মস্ত বড় ষাঁড় আমার দিকে তেড়ে আস্‌ছে ; তখন প্রাণ-পণে দৌড়ে বাড়ীর সদর দরজার কাছে আসি। আমার এই আচরণের পেছনে আছে এক জন্মগত প্রকৃতি। দৌড়াবার প্রবৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তি, আর এই ছু'টে পালানটা সহজাত প্রবৃত্তি-গত আচরণ। শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। এই দুই কাজ তাকে কোথাও শিখ্‌তে হয় নি ; জন্ম থেকে পেয়েছে। —এ সব ব্যাপারেই horme (অর্থাৎ 'এষণা' বা প্রেরণা) উঁকি মার্‌ছে। পাখী বাসা বাঁধে, মৌমাছি বা বোল্‌তা চাক্‌ তৈরী করে—এর পেছনেও সহজাত সংস্কার। এদের সংস্কার বাঁধা-ধরা কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, মানুষের বেলায় তা নয়। মানুষের সংস্কার নরম মাটির ডেলার মত অথবা গলিত মোমের মত ; নূতন ছাঁচে গ'ড়ে তোলা যায়। নূতন অবস্থার চাপে তার পরিবর্তন ঘটে বা ঘটান হয়। একটি মানব-শিশু তার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-বশে

নানা জিনিস ভাঙ্গে গড়ে; একজন পূর্ণ-বয়স্ক রাসায়নিক অথবা পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ নানা জিনিসের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন। শিশু ও বৈজ্ঞানিক—উভয়েরই মনের পেছনে প্রেরণা বা সংস্কার। শিশুর প্রেরণা ও তজ্জাত ক্রিয়াসমষ্টি অপরিপক্ব; পূর্ণ-বয়স্কের প্রেরণা পরিপক্ব অভিজ্ঞতার নূতন পরিচিতি। সেই জন্য মনে হয়—এই দুই পৃথক্ বস্তু। কিন্তু আসলে তা নয়। একই সহজাত সংস্কারের অবস্থান্তর মাত্র—একই জিজ্ঞাসার নব রূপ।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেন, আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের সকল কর্মের লক্ষ্য বা আদর্শ নির্ণীত করে; আমাদের সব-রকম মানস ক্রিয়ার পরিচালনা করে। সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ মানব-মনের জটিলতাময় উপাদান ঐ আদর্শের দিকে ধাবিত হয়; সুখ বা দুঃখের মধ্যে মানুষ ঐ আদর্শের সামীপ্য লাভ করে। এই মানস-সম্পদের পশ্চাদ্‌গত প্রবৃত্তি-সমূহ মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজ-গত জীবনকে আকার দান করে।

রস্ সাহেবের ভাষায় বল্‌তে হয়, জীবমাত্রেরই দুইটি প্রধান সংস্কার, একটি আত্মরক্ষার, অপরটি জাতি-রক্ষার প্রবৃত্তি। জাতি ও সমাজকে এক পর্যায়ে ফেলা যায়। তিনি একদিকে আমীবা (amoeba), অপরদিকে মানুষ—দুয়েরই সহজাত সংস্কারের আলোচনায় দেখিয়েছেন, আমীবা (ক্ষুদ্রতম জীব বা জীব-কোষ) জন্মিবামাত্র দ্বিখণ্ডিত হয়; এক থেকে দুয়ের সৃষ্টি হয়—বংশ-বিতান ঠিক থাকে। অথচ মানুষের সমাজরক্ষা করতে হ'লে আত্ম-বিসর্জন করতে হয়। আত্মরক্ষা করতে গেলে সমাজকে উপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারে দেখা যায়, মানুষের এই দ্বিবিধ

প্রবৃত্তির উৎস-মুখ এক। পরিবার-প্রতিষ্ঠা জাতি-সংরক্ষণের উপায়, আবার আত্ম-রক্ষারও প্রধান অস্ত্র। নিজ থেকে পরিবার, পরিবার থেকে বৃহত্তর পরিবার—মানুষের এই প্রগতি তার স্বভাব-সঙ্গত।

জন্ম-গত সংস্কারকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ সাহেব বলেছেন—**আভ্যন্তরীণ শারীর-মানস প্রবৃত্তি** (innate psycho-physical disposition)। এই প্রবৃত্তির বশে এর অধিকারী প্রথমে অনুভব করে, পরে মনঃসংযোগ করে এক শ্রেণীর বস্তুর প্রতি। এই বস্তু তার মনে একটি বিশেষ রকমের ভাব ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই উত্তেজনার ফল-স্বরূপ সে ক্রিয়াশীল হয়। এই ক্রিয়াপরায়ণতা এক বিশেষ ধারা অবলম্বন করে। ক্রিয়ার প্রকাশ না হ'লেও—তার দিকে তার প্রবৃত্তি জন্মে।*

সহজাত প্রবৃত্তি-বশে যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাতে তিনটি স্তর আছে। প্রথমে জানা, পরে অনুভব করা এবং শেষে কাজ ক'রে বসা, বা অন্ততঃ সেই কাজের দিকে ঝুঁকে পড়া। শুধু Reflex action, অর্থাৎ বহির্বস্তুর অভিঘাতে শারীর ক্রিয়া বা যন্ত্রবৎ প্রতি-ক্রিয়াকে সহজাত সংস্কারজ কর্ম বলা যায় না। সহজাত প্রবৃত্তিতে—তিনটি উপাদান আছে। কোন বহির্বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ামাত্র কোন নির্দিষ্ট জীব বা মানবের সমগ্র প্রকৃতির অভ্যন্তরে এক স্নায়বিক

* "We may then, define an instinct as an inherited or innate psycho-physical disposition which determines its possessor to percieve, and to pay attention to objects of a certain class, to experience an emotional excitement of a particular quality upon perceiving such an object, and to act in regard to it in a particular manner, or at least to experience an impulse to such action."

Social Psychology—W. McDougall P. 29.

আন্দোলন আরম্ভ হয়, যার গ্রহণশীলতা ক্রমবর্ধমান হ'তে থাকে; এই গ্রহণশীলতাই তার প্রথম উপাদান। দ্বিতীয় উপাদান—এমন একটি কেন্দ্রীয় শক্তি, যার বলে শরীরের মর্ম-সন্ধিগুলি স্নায়ু-শক্তি-তরঙ্গে অভিহত হ'য়ে জীব বা মানবকে সক্রিয় ক'রে তোলে। এই সক্রিয়তা কিন্তু তৃতীয় উপাদান। প্রথম ও তৃতীয় উপাদান কালক্রমে পরিবর্তনের অধীন হয়, কিন্তু এই দ্বিতীয় বা কেন্দ্রীয় শক্তি অপরিবর্তিত ভিত্তিরূপে, জীব বা মানবের সারাজীবনে স্থায়ী হয়। মানুষের বেলায় এই ব্যাপার, অর্থাৎ তাহার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যস্থিত এই অপরিবর্তনীয় ভিত্তি এবং নিত্য-নূতন পরিস্থিতির পরিবেষ্টনে নবতর অবস্থা-বিপর্যয়—অন্য জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প। এ কথার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে।

মনীষী ম্যাক্‌ডুগ্যালের পূর্বে instinct বা সহজাত প্রবৃত্তির মূলান্বেষণ আরও অনেকে করেছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অবৈজ্ঞানিকের মত যেখানে সেখানে instinct কথাটির প্রয়োগ ক'রেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্বাপর বিশ্লেষণ ক'রে এ বস্তুটির এমন দীর্ঘ আলোচনা আর কেউ করেন নি। **হার্বার্ট্ স্পেন্‌সর** বল্‌তেন, সহজাত প্রবৃত্তি স্নায়বিক ক্রিয়া-মাত্র। **এসিডন্** ব'লেছেন, "সহজাত প্রবৃত্তির মূল উৎসভূমি সেই আদ্যাশক্তি, যার প্রতিফলন প্রতিজীবে হয়।" **কার্‌বি** এবং **স্পেন্‌স্** লিখেছেন, "জীবের সহজাত সংস্কার বিশ্বস্রষ্টার দান; শিক্ষা, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার বাইরে তার স্থান; জীবমাত্রেই এক ঐশী শক্তির বলে ব্যষ্টি ও জাতির সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি কাজ ক'রে বসে, তাকেই বলা যায়—সহজাত প্রবৃত্তি।" অধ্যাপক কার্ল্ গ্রুস্

consciousness, অর্থাৎ চেতনা বা অববোধকে সহজাত প্রবৃত্তির আওতার মধ্যেই আন্‌তে চান না। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেন, চেতনা বা অববোধকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিসমূহের মানস অংশকে বাদ দিলে মানুষের জীবনেতিহাস অজ্ঞতার অন্ধকারেই ডুবে থাক্‌বে। জন্মগত সংস্কারধারা মানুষের সমাজ-জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে, এবং সেইজন্যেই, মানুষের শিক্ষা-ব্যাপারে—এর আলোচনা বিশেষ আবশ্যক।

প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মূলে, তার কেন্দ্রীয় শক্তি-স্বরূপে আছে একটি মূল ভাবের দ্যোতনা বা বিলাস (emotion)। এই দ্যোতনার মাধ্যমে সহজাত প্রবৃত্তি কর্মরূপে প্রকাশ পায়। অপত্যস্নেহ-মূলক ক্রিয়ার ভিত্তি তজ্জাতীয় ভাববিলাস। স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে এর প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অপত্য-স্নেহ প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সকল প্রকার স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্ত্রীজাতির এই অপত্য-স্নেহ দেখা যায়। দুগ্ধ-ক্ষরণ প্রস্ফুট মাতৃত্বের একটি লক্ষণ। এটি শারীর ক্রিয়া। সন্তানকে দেখ্‌লে, ছুঁলে, এমন কি না দেখ্‌লেও মাতৃ-জাতির দুগ্ধ-ক্ষরণ হয়। এতেই সমাপ্তি নয়। এই শারীর ক্রিয়ার পেছনে মনের ধাক্কা আছে। এই মন আছে ব'লে—পক্ষিণী আহার্যের জন্য ছু'টে বেড়ায়। কোন কোন শ্রেণীর সন্তান মায়ের সাথে সাথে চলে। কীট-ভুক্ পাখীদের বেলায় এ-রকমটা বেশী দেখা যায়। কোন কোন পাখীর ছানা বাসায় ব'সে থাকে, মায়ের ফির্‌বার আশায়। মায়ের এই ঘোরা-ফেরার মধ্যে শুধু প্রবৃত্তি (instinct), শুধু ভাব-দ্যোতনা (emotion) নয়, প্রচুর বুদ্ধি (intelligence) যুক্ত আছে। জীব-ভুক্ ও

শস্যভুক্‌দের ভিতর এই বুদ্ধি-মত্তার স্পষ্টতা দীপ্যমান। পুং-জাতীয়েরাও সহায়তা করে। এই ভাবে পরিবার-প্রতিষ্ঠা হয়।

খরগোস এতটা উন্নত নয়। তার বুদ্ধি-বিকাশ কম। সে স্তন্যপায়ীদের নিম্নশ্রেণীর জীব। সে কতকগুলি সহজাত সংস্কারের বাণ্ডিল। সেও কিছুকালের জন্য সন্তান পালন ক'রে ছেড়ে দেয়। মাংসাশীরা কিঞ্চিৎ উন্নত। তাদের শাবকেরা বেশী অসহায়; তাদের যৌনধর্ম বিলম্বে প্রকাশ পায়; তাদের প্রতিপালনের অনেক রকমারি।

মানুষ আশ্চর্য জীব—সবার উপরে। সকল প্রাণীর বিবর্তন-ধারা পলিমাটি ফেলেছে তার মনে। প্রকৃতির ধ্যান ও সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মানুষে। পশু-রাজ্যের গণ্ডী থেকে তাই সে মাথা তুলে বেরিয়েছে, দুনিয়াটাকে সে দেখ্‌তে ও নাড়্‌তে-চাড়্‌তে শিখেছে। তাই তার মনে—জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত জন্মেছে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল, তাঁর "Social Physchology" গ্রন্থে জীব ও মানবের সহজাত প্রবৃত্তিসমূহকে প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ—'An outline of Psychology'তে চৌদ্দ ভাগ ক'রেছেন। প্রথম গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে জীবের যে-সকল ক্রিয়ার বা ক্রিয়ার মূলীভূত প্রবৃত্তির আলোচনা ক'রেছেন, তা'দেরকে 'instinct' আখ্যা দেন নি। তাঁর যুক্তি এই যে, এ সকল ক্রিয়ায় কোন স্থায়ী, কেন্দ্রীয় বৃত্তির ভিত্তি নেই। এই শ্রেণীর ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিতে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য নেই; এরা অতি সাধারণ রকমের।

(১) তিনি প্রথমে ধ'রেছেন, **পলায়নের প্রবৃত্তি**, যার মূল ভাব ভয়ে। ভয় জন্মিলে জীব ও মানবের চল্‌বার শক্তি বেড়ে যায়; এই

চলচ্ছক্তি এত প্রবল হয় যে, শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলি তাল দিয়ে উঠ্‌তে পারে না ; এর ফলে হয় অবসাদ এবং কখনও বা মৃত্যু। গল্প আছে, একজন পালোয়ান প্রথম বয়সে একটা ভীষণ জন্তুর তাড়া খেয়ে করে পলায়ন ; এমন দৌড় সে দেয় যে একটা দেয়াল টপ্‌কে যায়। পূর্ণবয়স্ক কুস্তীগীর হওয়ার পূর্বে সে আর ঐ ভাবে দেয়াল টপ্‌কাতে পারে নি। ভয়ে লোক পাগল হ'য়ে যায়, দেখা গেছে। নানারকমের বস্তু ভয়ের উদ্রেক করতে পারে। আদিম মানবের ভয় কিসে জন্মাত, ঠিক বলা কঠিন। শিশুদের কান্না বেশীর ভাগ ভয় থেকে ; তবে শিশুর জননী বুঝ্‌তে পারেন, কোন্ শিশুর কান্না ভয়ে, কে কাঁদ্‌ছে রাগে, কে কাঁদ্‌ছে কোন দৈহিক অস্বস্তির জন্যে। চীৎকার বা হঠাৎ হৈ-চৈ-শুন্‌লে শিশুরা প্রায়ই কেঁদে উঠে। এই অভ্যাসটি অনেকের শেষ বয়স পর্যন্ত টিকে থাকে। অনেকের ঝড়-বৃষ্টিতে আতঙ্ক জন্মে ; পাকা বাড়ীতে থাক্‌লেও ভয়ে থরহরি কম্প চল্‌তে থাকে। সাধারণ জন্তুদের পলায়ন-প্রবৃত্তিটাই প্রবল। কোন কোন মানুষও, বেশী ভয় পেলে কোন-কিছু দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে। আদিম-যুগের মানুষের এই রকমের অভ্যাস ছিল। অভ্যাসটি আজও রয়ে গেছে। শিশুরা ভয়ের কারণ বুঝেও বুঝ্‌তে পারে না বা চায় না। মুখের বিকৃত ভঙ্গী বা পরিচিত বন্ধুর অস্বাভাবিক গর্জন প্রচণ্ড ভয় জন্মিয়ে দেয়। হয়ত কোন শিশু জানে, তার একজন খেলার সাথী মুখোস্ প'রে বিকট মূর্তি ধরেছে ; সে জেনে-শুনেও ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, ক্রোধ, করুণা, স্নেহ বা ঔৎসুক্য মানুষের মনে ঢেউয়ের মত চ'লে যায় ; কিন্তু ভয় একবার জন্মালে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

এই জন্যেই প্রাচীন যুগের মানুষ ভয়ে ভয়ে মত্তার তাণ্ডব থেকে বিরত হয়েছে। সমাজে শাসন এসেছে।

(২) ঘৃণা প্রবৃত্তির মূল ভাব বিরক্তি-বোধে। দুর্গন্ধ-যুক্ত বা নোংরা জিনিস দেখ্‌লে মুখে থুথু আসে। মানুষের এ সংস্কার আদিম যুগের। পিচ্ছিল জিনিস বা প্রাণীর সংস্পর্শে সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি আসে—গা ঘিন্ ঘিন্ করে। মানুষের এই প্রবৃত্তি মার্জিত হ'লে নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচরণ এবং সকল রকম অন্যায়ের প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ জন্মে। ক্রূর প্রকৃতির লোককে আমরা বলি সাপ ; কখনো হয়ত বলি, "লোকটার কথা বল্‌তে বা শুন্‌তে গেলে আমার গা বমি-বমি করে।" এই ঘৃণা প্রাথমিক প্রবৃত্তির পরিবর্ধন ও উন্নয়ন।

(৩) ঔৎসুক্য একটি স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ; এর মূল ভাব বিস্ময়-বোধ। যে-বস্তু দর্শনে ভয় জন্মে, তাতে বিস্ময়ও জন্মে। কেবল ওজনের তফাৎ। মাটির উপরে যদি একটা পুরোণো ছেঁড়া কোট প'ড়ে থাকে, তাহলে তা দেখে একটা ঘোড়া একবার ঔৎসুক্য-ভরে এগুবে, একবার ভয়ে পিছুবে। ছোট ছোট মানব-শিশুর বেলাতেও তাই দেখি। ঔৎসুক্য বা আগ্রহের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে মনো-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন আছে। আজ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে-সব লোকের স্বভাব-জাত আগ্রহ বেশী, তারাই চিন্তা-জগতে বৃহৎ স্থান অধিকার করেছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে যাঁরা জগৎবাসীকে কিছু দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের অনুসন্ধিৎসার পেছনে ছিল অফুরন্ত ঔৎসুক্য বা বিস্ময়-বোধ।

(৪) যে-বস্তুতে যে স্বভাবজ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, সে-বস্তুকে বলা যায় চাবি, যাতে প্রবৃত্তি-রূপ তালাটি খোলা যায়। ইংরেজি

ভাষায় যে প্রবৃত্তিকে বলা হয় pugnacity, বাংলা ভাষায় তাকে বলা যায় **রণ-লিপ্সা**। এর মূলীভূত ভাব—ক্রোধ। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ এই প্রবৃত্তিকে মৌলিক প্রবৃত্তি বল্‌তে দ্বিধা বোধ করেন। জীব বা মানবের অন্য যে-কোন প্রবৃত্তির পরিপূরণে বাধা জন্মিলে, বা কেহ জন্মাইলে, রণেচ্ছা বা তৎ-সম্পর্কে ক্রোধ জাগরিত হয়। অত্যন্ত দুর্বল-চিত্ত একটা কুকুরও যদি ক্ষুধার্ত থাকে, আর যদি কেউ তার মুখের মাংস বা অস্থিখণ্ড কেড়ে নিতে চায়, তবে তার ক্রোধ জেগে ওঠে। কোন ছোট ছেলের আহার-কালে বাধা জন্মালে সে রেগে আগুন হয়। বুড়োদেরও এ স্বভাব যায় না। পশুদের যৌন-সম্ভোগে বাধা সৃষ্টি করলে, তাদের রাগের মাত্রা চড়ে যায়। হয়ত বা এই জন্যেই সিংহের বা অশ্বের কেশর ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন। পুরুষে পুরুষে লড়াই করবার এতে সুবিধা হয়। মানুষ যেখানে গর্জন ক'রে তেড়ে আসে, শিশু হয়ত সেখানে কামড়াতে চায় অথবা কামড়াতে ধায়। এই স্বভাবজ বৃত্তি সংশোধিত এবং মার্জিত হ'লে কর্মৈষণা বৃদ্ধি পায়। যার ভিতরে এই জিগীষার অভাব, তার উষ্মার হ্রাস, সুতরাং উৎসাহেরও হ্রাস। জীবন-যুদ্ধে তার অস্ত্র-ভাণ্ডার রিক্ততায় পর্যবসিত হয়।

(৫) আর একটি বৃত্তি—**আত্মপ্রচার**। এর মূল ভাব (emotion) আত্মপ্রসাদ। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিকে ভিন্ন কোঠায় ফেল্‌তে অনেকের আপত্তি। ফরাসী পণ্ডিত Ribot এর নাম দিয়েছেন—"Positive self-feeling," অর্থাৎ একরকমের আত্মম্ভরিতা। ম্যাক্‌ডুগ্যাল এই মত গ্রহণ ক'রেছেন। তবে, মনুষ্যেতর জীবে এই ভাব কতখানি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাক্‌লেও কিছু যে আছে

স্বীকার কর্‌তেই হবে। এই অহংকৃত ভাব-বিলাসের প্রধান অবলম্বন সঙ্গলিপ্সা। দশজনের মাঝে আমি একজন, আমি সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিই, অন্যে আমার পৌরুষ ও বাহাদুরী বুঝে নিক্—এই রকমের ভাব এই প্রবৃত্তির খোরাক জোগায়। এই প্রবৃত্তি পশুদের মধ্যে ক্ষীণ, মানুষে বেশী। ছোট-খাট কুকুরের পালে যদি বড় রকমের জাঁদ্‌রেল এক কুকুর দাঁড়ায়, তবে তার শ্ব-বৃত্তিতে মানুষের যোগ্য প্রবৃত্তি থাক্‌তেই পারে, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে। শাবকদের মাঝে যখন একটা মুরগী বুক ফুলিয়ে চলে, তখন সে তার আত্মম্ভরিতার আস্বাদ পায় বৈ কি! এ আস্বাদে আনন্দ পায় অশ্বজাতি, যখন অশ্বাদের মাঝে তাদের পৌরুষ জাগে, যৌন-সম্পর্কের লক্ষণগুলি সর্বাঙ্গে প্রকট হয়ে উঠে। ময়ূরের পেখম, পায়রার রং-বেরং-এর বুকের গঠন প্রকৃতির সৃষ্টি বটে, কিন্তু এই সৃষ্টির রহস্য কি এই আত্ম-বিনোদনের প্রচারের উদ্দেশ্যে? এ-কথার জবাব কে দিবে? উন্মাদ-রোগে এই প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক প্রকাশ। উন্মত্ত ব্যক্তি মনে করে, তার অসাধারণ শক্তি, অগণিত ধন-রত্ন, অনুপম সৌন্দর্য, অতুলনীয় গোষ্ঠী-সুখ। সে ভাবে তাই, ভেবে গর্ব অনুভব করে।

শিশুরা তাদের চালচলনে, আত্মবোধের দৃষ্টান্ত দেখায়। তারা হাঁট্‌তে বা কথা বল্‌তে শেখার আগে গোষ্ঠীর পাঁচ জনের সাম্‌নে—পিতা-মাতার সাম্‌নে প'ড়ে গেলে চেচিঁয়ে উঠে; এতে, বোধ হয়, তাদের লজ্জা বা অপমান-বোধ জাগে, অর্থাৎ অহঙ্কারে বাধে। নূতন জামা প'রে—দশজনকে না দেখিয়ে সে যেন সোয়াস্তি পায় না। ম্যাক্‌ডুগ্যাল সাহেব নিজের খোকা-খুকীদের সম্বন্ধে এ মন্তব্য ক'রেছেন।

(৬) পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব নিজকে ছোট করায়। একে ইংরেজিতে বলা হয় self-abasement, অর্থাৎ **আত্ম-বিলোপ**। এই ভাব পশু ও শিশু দুয়ের মধ্যেই আছে। যদি আত্মবিলোপের অর্থ হয় লজ্জাবোধ, তবে পশুতে তা খুব বেশী নেই। কুকুরদের এই প্রবৃত্তি আছে। বড় একটা বাঘা কুকুর দেখ্‌লে—সাধারণ কুকুর লেজ গুটায়। শিশুদের এই বৃত্তিকে ভয়ের কোঠায় কেউ কেউ ফেল্‌তে চান। যখন কোন শিশু মায়ের কোলে চুপ্‌ ক'রে বসে থাকে—মুখ ফিরিয়ে, তখন কোন অচেনা লোককে দেখ্‌লে—আড়্‌-চোখে মিট্‌-মিট্‌ তাকায়। এর কারণ ভয় নয়; নিজকে ছোট ক'রে দেখা।

(৭) **অপত্য-স্নেহ**। পূর্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। ম্যাক্‌ডুগ্যালের বিবৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Ribot বলেন, অপত্য-স্নেহ জীব ও মানবের সহজাত। আত্মোৎসর্গ এর মূল উৎস। অতি নিম্নস্তরের জীবে—এই উৎসর্গের মহৎভাব নেই বল্‌লেই চলে। মাছ ডিম পেড়ে লক্ষ লক্ষ ডিম যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দেয়। তার মধ্যে হয়ত দু' একটি মৎস্য-সন্তান জীবিত থাকে। মৎস্যের অপেক্ষা উন্নততর জীবের সন্তান-সংখ্যা যত কম, অপত্যপ্রীতি তত অধিক। এদের এই প্রীতির মধ্যে অন্ধতা ক্রমশঃ দূর হয়েছে। শুধু শারীর বৃত্তির স্থানে মানস ব্যাপার আধিক্য পেয়েছে। মানস ব্যাপারে উন্নত জীব সন্তান-রক্ষার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টিত হয়; তাতে বংশ রক্ষা পায়। সন্তান-পালনে মায়ের স্থান সকলের উপরে—পশুর ভিতরেও তাই। পিতা কখনও কখনও

মাতার স্থান অধিকার করে, বিশেষ প্রয়োজনে। বর্বর যুগের মানুষ নাকি সন্তানকে পীড়া দিত; স্নেহ-প্রবণতা তাদের খুব অল্প ছিল, এ কথা শোনা যায়। কিন্তু অনেকে হয়ত দেখেছেন, কোন কোন নর-খাদক মানুষও সন্তানকে কোলে ক'রে আদর দেখায়। সন্তান একবার তার চিত্ত আকর্ষণ করলে তার প্রীতি উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই থাকে। আবার, সন্তানের রক্ষা-কল্পে তার অনিষ্টকারীর প্রতি ন্যায্য ক্রোধও স্বাভাবিক। এই দুই বিমিশ্রভাব, অর্থাৎ স্নেহ ও ন্যায়-সঙ্গত প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি—অপত্যপ্রীতির মৌলিক উপাদান। * জাতি ও সমাজরক্ষার জন্যই—এই মৌলিক প্রবৃত্তি, বিমিশ্র ও বিপরীত-ধর্মী হ'লেও, মানুষের মনে এক উচ্চতর ত্যাগ-বোধ, altruism, জন্মিয়ে দিয়েছে। শিশু-পালনের দায়িত্ব যাঁদের—তাঁরা এ সত্যটি যেন না ভোলেন।

উপরের সাতটি ছাড়া—আহার্যের অন্বেষণ, সঙ্গলিপ্সা, দুঃখ-বোধ-জনিত আবেদন, স্বত্ব ও অধিকার-বোধ, গঠন-শীলতা, হাস্য-পরিহাস এবং সর্বোপরি যৌন-বৃত্তি বা কাম—জীব ও মানবের স্বভাব-গত ধর্ম। শেষোক্তটি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করতে গেলে ফ্রয়েড্-তত্ত্ব আন্‌তে হবে।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় **ভাব-বিলাস** (emotion) এবং **বুদ্ধিমত্তা** (intelligence)। পূর্বে বলা হয়েছে—স্বভাবজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি মূল ভাবের প্রকাশ হয়। এই মূল ভাবকে ঐ প্রবৃত্তির

* "Thus, paradoxical as it may seem, beneficence and punishment alike have their finest and most essential root in the parental instinct."
Mc. Dougall—"Social Psychology", P. 73

দ্যোতক বা অনুপ্রেরক বলা চলে। এই ভাব-বিকাশের কালে ঐ ভাবানুগত ব্যক্তির দেহে কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। আর তার মনে তৎকালের জন্য একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা ঐ ভাব-বিকাশের প্রাণ-স্বরূপ। আর একটি বিশেষত্ব এই, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ নিজের মনের স্বরূপটি দেখতে পায়। এই স্বরূপ-দর্শনের ফলে অনেক সময়ে প্রবৃত্ত ভাবটির সংযম বা দমন ঘটে। ভয় বা ক্রোধ প্রচণ্ড প্রবৃত্তি; এরা মৌলিক প্রবৃত্তি; ভাবের সংমিশ্রণ এ দুয়েতে খুব কম। কিন্তু, আমাদের মনে, এমন সব ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, যাদেরকে সংমিশ্রণ-মূলক ভাবাবেগ বলতে হয়। ঘৃণা, বিস্ময়, বিরক্তি, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি—এগুলি বিমিশ্র ভাব। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদের কোন-কোনটিতে দুই, কোন-কোনটিতে তিনটি মৌলিক ভাবাবেশের সমাবেশ হয়েছে। ম্যাকডুগ্যাল এদের নাম দিয়েছেন--"Secondary emotion"। কতকগুলি বিষয়ে মনীষী জেম্‌সের মত-বাদকে তিনি স্বীকার করেন নি। জেম্‌স্ বলেন, কোন ভাব-বিলাসের মধ্য দিয়ে যখন কোন স্বভাবজাত প্রবৃত্তি স্ফূরিত হয়, তখন শারীর লক্ষণগুলি প্রাধান্য লাভ করে; আগে কাঁদি, তবে দুঃখ-বোধ জন্মে; আগে কাউকে আঘাত করি, তবে বুঝি ক্রুদ্ধ হয়েছি; আগে কাঁপি, তবে বুঝি ভয় ধ'রেছে। আমার মনের গহ্বরে আলো ফেললে দেখতে পারব, শারীর ক্রিয়ার প্রকাশ না হ'লে কোন ভাবাবেশ সম্ভবপর হয় না। আমার মনের সব রকম রূপ, অর্থাৎ সাময়িক মেজাজ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার পশ্চাতে আছে দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন; আমার দেহ-বোধের অভাব ঘটলে এই সকল মনোভাব অপ্রকাশিত থাকবে, শুধু বুদ্ধিবৃত্তির

বিচারে এগুলিকে ধরতে হবে।* জেম্‌সের এই যুক্তির প্রতিবাদ কর্‌তে গিয়ে ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, কোন কমলা-লেবুর রং অথবা কোন ঘণ্টাধ্বনির অনুভূতি আনতে গেলে প্রতি বারেই কি অক্ষি-গোলকে বর্ণের প্রতিফলন কিংবা শ্রুতি-পটহে প্রতিধ্বনির প্রয়োজন হবে? আগে এই দৈহিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হবে, তার পর অনুভূতি বা ভাবাবেগ আস্‌বে, এ কথা কি ঠিক? জেম্‌স্ সাহেব ভুলে যাচ্ছেন যে বোধ-শক্তির জাগরণের ব্যাপারে কল্পনা-কুশলতার কেন্দ্রীয় আকর্ষণ আছে; এই জাগরণে ইন্দ্রিয়গুলির সক্রিয়তার সহায়ক-স্বরূপ দৈহিক বৈলক্ষণ্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা নেই। মৌলিক এবং মিশ্র, উভয় প্রকার ভাবাবেগের সম্বন্ধে উভয় পণ্ডিতের যুক্তি পরস্পরকে খণ্ডিত করে। শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের স্বভাব-জাত সংস্কার, প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া শিক্ষকের ব্রত। এই মোড়-ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য পৃথিবীর নব নব যুগে নব-তর সমাজ-সংগঠন।

ম্যাক্‌ডুগ্যালের সংজ্ঞায় স্বভাব-জাত-প্রবৃত্তি, বা instinct-এর পেছনে আছে কর্মোদ্যম, যা উদ্দেশ্য-মূলক। বুদ্ধিমত্তা, বা

* "Emotion dissociated from all bodily feeling is inconceivable. The more closely I scrutinize my states, the more persuaded I become that whatever moods, affections, and passions I have are in very truth constituted by and made up of those bodily changes which we ordinarily call their expression or consequence; and the more it seems to me that if I were to become corporeally anaesthetic—I should be excluded from the life of the affections, harsh and tender alike, and drag out an existence of merely cognitive or intelectual form."

"Principles"—Vol. II P. 452 (Quoted by Dr. Mc.Dougall).

intelligence-এর কাজ ঐ স্বভাবজাত প্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন —অতীত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বুদ্ধিমত্তার মূলে বিচার-শক্তি ; যে মানুষের মধ্যে বিশ্লেষণ-শক্তি আছে, সে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার— কোন্‌টা ভাল, গ্রহণ-যোগ্য, কোন্‌টা মন্দ, বর্জনীয়—তা ঠিক কর্‌তে পারে, অর্থাৎ যুক্তির সঙ্গতি-রক্ষা করতে পারে ; "দুয়ের সঙ্গে দুই মেশাতে পারে।" বুদ্ধিমত্তার অভাব যার, সে বিশ্লেষণ-ক্ষমতার অভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না। আমীবা হ'তে শুরু ক'রে মানুষ পর্যন্ত—জীব-জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে ধাপে ধাপে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবেষ্টনে—এই বিচার-শক্তির লীলা মনোবিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে।

কোন কোন মনস্বী ভিন্ন মত পোষণ করেন। এঁদের দলে পড়েন—ফরাসী পণ্ডিত **বার্গ্‌সঁ**। তিনি বলেন, জীব ও মানবের বিকাশ বা অভিব্যক্তির পথে কিছুদূর পর্যন্ত সংস্কার ও বুদ্ধিমত্তা (instinct ও intelligence) এক সঙ্গে চলে ; তার পর—এরা ভিন্ন পথে ধাবিত হয়। পতঙ্গ-জাতির ক্রম-বিকাশে instinct প্রাধান্য ও পূর্ণতা লাভ ক'রেছে, কিন্তু মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী জীবের অগ্রগতিতে intelligence একমাত্র অবলম্বন। এই intelligence মানুষে এসে চরমে পৌঁছেছে। মানুষের মেধা (intellect) এই যাত্রাপথের শুধু পাথেয় নয়, পুরস্কার। এই মেধার ভিতরেই তিনি স্বভাব-জাত সংস্কার, অর্থাৎ instinct-এর একটি নব-রূপের পুনরাবিষ্কার করেছেন। এর নাম তিনি দিয়েছেন—philosophical intuition বা **অন্তর্দৃষ্টি**। এই বস্তুটি থাকাতেই মানুষ সৃষ্টি-ক্রমের শীর্ষ-স্থানীয়।

বার্গ্‌সঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Creative Evolution'-এ তিনি দেখিয়েছেন, উদ্ভিদের অবসাদ বা সুপ্তি, জীব-জগতের স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি এবং জীব ও মানবের বুদ্ধিমত্তা একই প্রাণ-শক্তির সমুৎসারণ; ক্রমোন্নতির ফলে—এরা ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এরিষ্টট্‌লের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণ একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে মনে করেছেন, উদ্ভিজ্জীবন, কীট-পতঙ্গের সংস্কারাবদ্ধ জীবন এবং মানুষের যুক্তি-গত জীবন—পর পর একই পথে বিকাশ লাভ করেছে, অর্থাৎ বিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ভিন্ন পথের যাত্রী। এদের পার্থক্য শুধু পরিমাণ-গত নয়, প্রকার-গত।* রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরায়" যা কবির অনুভূতির আলোকে পেয়েছি, বার্গসঁর বিশ্লেষণেও পেয়েছি তাই—নূতনরূপে। উদ্ভিদ্ ক্রম-বিকাশের পথে কিছুদূর এগিয়ে—থেমে গেল। জীবনের লীলায় তার চলার দরকার হল না। জল, হাওয়া ও মাটি থেকে কার্বন্ ও নাইট্রোজেন প্রয়োজনমত গ্রহণ করলেই তার জীবন-রক্ষা হয়; খনিজ দ্রব্যের আকারে উদ্ভিদ্ এই দুই খাদ্যের

* Vegetative torpor, instinct, and intelligence—these, then, are the elements that coincided in the vital impulsion common to plants and animals, and which, in the course of a development in which they were made manifest in the most unforseen forms, have been dissociated by the very fact of their growth. The cardinal error which, from Aristotle onwards, has vitiated most of the philosophies of nature, is to see in vegetative, instinctive and rational life, three successive degrees of the development of one and the same tendency, whereas they are three divergent directions of an activity that has split up as it grew. The difference between them is not a difference of intensity, nor, more generally, of degree, but of kind."

—"*Creative Evolution.*" *P. 142.* (*Bergson*)

সারভাগ গ্রহণ করে এবং পুষ্ট ও পল্লবিত হয়। অন্য জীব এই সকল মৌলিক পদার্থকে আহার্য-স্বরূপ গ্রহণ করতে অক্ষম; উদ্ভিদের অভ্যন্তরস্থ জৈব পদার্থ জীবের ভক্ষ্য; এক কথায়, পশ্বাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অথবা তারা উদ্ভিদ্-ভোজী জীবান্তরের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে একই ফল লাভ করে, অর্থাৎ বেঁচে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্ভিদ্ খনিজ মৌলিক পদার্থের মধ্য থেকে জৈব ভক্ষ্য পদার্থ সৃষ্টি করে। জীব এই ভক্ষ্য বস্তুর সন্ধানে চঞ্চল ও চলমান হয়। আমীবা থেকে শুরু ক'রে উন্নত স্তরের জীব পর্যন্ত—সবাই শূন্যস্থানে চলচ্ছক্তির অধিকারী হয়। এক ফোঁটা জল থেকে আমীবা তার অতি ক্ষুদ্র শুঁড়-জাতীয় অঙ্গ প্রসারিত ক'রে জলস্থ জৈব পদার্থের সার-সংগ্রহ করে; তাকে জলের ফোঁটার মধ্যে ভ্রাম্যমান হ'তে হয়। উন্নত জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় আছে; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় (sense-organs) সে শীকার চিন্‌তে পারে; কর্মেন্দ্রিয়ের বলে (locomotor organs) সে চলে ও শীকার ধরে। এই দুই শ্রেণীর বহিরিন্দ্রিয়ের পটভূমিকাস্বরূপ স্নায়ুতন্ত্র জীবের গতি-ধর্মকে বিশেষিত করে। জীব-কোষ জীব-দেহে যে আবরক পদার্থের মধ্যে থাকে, তার ভিতর তার চলা-ফেরার স্বাধীনতা আছে; কিন্তু উদ্ভিদ্-কোষের আবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এমনি সঙ্কীর্ণ যে তাতে কোষের চলচ্ছক্তি রহিত হ'য়ে যায়। এই জন্য যুগ-বিবর্তনের ফলেও দেখা যায়, প্রয়োজনের অভাবেই উদ্ভিদ্ চলৎশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে; সে উদ্ভিদের উপযোগী অবসাদ বা তন্দ্রাপরায়ণতার অধীন হ'য়ে পড়েছে। Droserd ও Dionaea-নামক দুই জাতীয় পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের জীবনে—এই প্রকৃতির

ব্যতিক্রম দেখা যায়। লজ্জাবতী লতার লজ্জা ভেঙ্গে গেছে, অর্থাৎ তার মনশ্চৈতন্যের তাগিদে, কিছু পরিমাণে, তার গতি-চাঞ্চল্য আচার্য জগদীশের যন্ত্রে ধরা পড়েছে। আবার, কতকগুলি পরভৃত প্রাণী (ও তাদের বিশেষ বিশেষ শ্রেণী) স্থিতি-ধর্মী। এ বিষয়ে বার্গ্‌সঁ হুসের (Houssay) উল্লেখ ক'রেছেন। পণ্ডিত হুসের গবেষণা— বার্গ্‌সঁর বক্তব্যকে স্ফুটতর ক'রে তুলেছে। আগা-গোড়া তাঁর বক্তব্য এই, জীবনের সমগ্রতা একটি প্রচণ্ড প্রবাহ। একটি কেন্দ্র থেকে এই প্রবাহ উৎসারিত। এই উৎস বহির্মুখ। পরিধিতে পোঁছে এই উৎস বহুধা হয়েছে। একটি বিশেষ স্থানে বাধা অতিক্রান্ত হয়েছে। সৃষ্টি-বেগ মুক্তিলাভ করেছে। মানুষে এসে এই মুক্তি প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষ বাদে সর্বজীবে চেতনার সীমা-রেখা টানা হয়েছে। মানুষের চেতনা সর্বদাই গতিশীল। অনির্দিষ্ট কালের জন্য মানুষ এই জীবন-প্রবাহকে টেনে চলছে। জীবনের সব-খানি তার সাথে নেই। সৃষ্টির প্রথম থেকে জীবন-প্রবাহের ভিন্ন ধারায় ভিন্ন ধর্ম বা প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রেছে। তার কিছুটা অংশ মানুষে আছে। যেন মনে হয়, মানুষ বা অতি-মানুষ একটি সুপ্রাচীন, নিরাকার, অস্পষ্ট সত্তা থেকে ক্রম-বিবর্তনের ধারা বেয়ে আত্ম-সাধনার যাত্রা-পথে বেরিয়েছে। এই প্রগতির কালে সে নিজের সত্তার বহুল অংশ বর্জন ক'রেছে। এই পরিত্যক্ত অংশের সমষ্টি জীব-জগতে। উদ্ভিদেও মানুষের বর্জিত অংশের প্রমাণ সুস্পষ্ট। বিবর্তনের আকস্মিকতার উর্ধ্বে মানুষের আসন। এ যেন যাত্রা-পথে আবর্জনার বোঝা ঝেড়ে ফেলা। মানুষের সম্বিৎ তার যুগে যুগে সঞ্চিত স্মৃতিকে বহন করে। তাই বুঝি তার মাঝে

মাঝে ইচ্ছা হয় বসুন্ধরার শ্যামলতার মধ্যে আত্মহারা হ'তে, আরব-বেদুঈনের মত প্রাণ-ধর্মী হ'তে। মানুষের চৈতন্যের প্রধান উপকরণ—তার বুদ্ধিশক্তি (intellect)। অন্তশ্চৈতন্য বা intuitionও মানুষের বড় সম্বল। এই দুয়ের পরিপূর্ণ যোগ-সাধন কর্‌তে পারলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা আস্‌বে। মনুষ্যত্বের যে-ধারায় আমরা চল্‌ছি, বার্গসঁ বলেন, তাতে বুদ্ধি-শক্তি অন্তশ্চৈতন্যকে গ্রাস ক'রেছে। সে যেন একটি স্তিমিত প্রদীপের মত মাঝে মাঝে ক্ষীণ রশ্মি বিকিরণ করে। এই বুদ্ধি-শক্তিকে বিকশিত ক'রেই মানুষ—জড়, জীব ও মনোজগতে আধিপত্য কর্‌ছে। শিক্ষা-ব্রতীর কাজ শৈশব থেকে মানুষের এই বুদ্ধিশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও জন-কল্যাণের জন্য প্রযুক্ত করা।

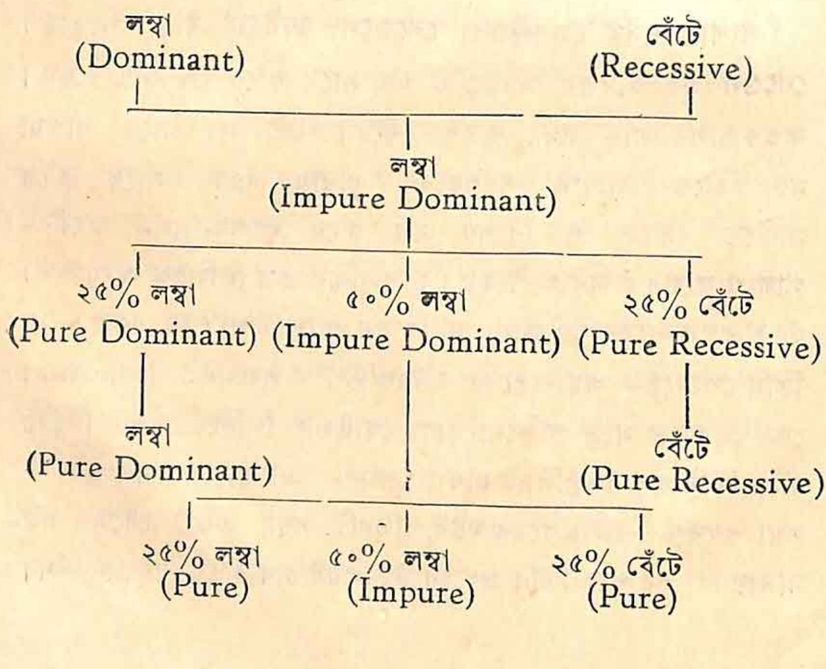
বংশ-বিতান ও বিবর্তন

আমাদের সংস্কার ও ভাবাবেগ দুই ভাবে গাঁথা হয়, কতকগুলি বংশ-গত, কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আবেষ্টন-গত। পিতৃ-পিতামহের, অর্থাৎ পূর্বপুরুষের প্রকৃতি সন্তান-ধারায় অভিব্যক্ত হয়। আমরা চল্‌তি কথায় বাপ-মায়ের রক্তের উল্লেখ করি। প্রজনন-ব্যাপারের গোড়ার কথা বিস্ময়ের বস্তু। Eugenics বা জনন-বিজ্ঞান, Biology বা জীব-বিজ্ঞান এবং Psychology বা মনো-বিজ্ঞান, ভিন্ন হয়েও গভীর-ভাবে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভারতে জনন-শাস্ত্রের বিপুল আলোচনা হয়েছে। সমাজ-গঠনের সুকঠিন কাজে রত হয়ে প্রাচীন ঋষিগণ বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে বিশিষ্ট বংশের বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এবং নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। শুক্র-শোণিতের সম্পর্ক ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞানে বিশ্লেষণ-প্রথায় আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা নূতনতর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে **গ্যাল্‌টন**—প্রথমে বলেছিলেন, নব-জাত শিশুর মধ্যে শিশুর পিতা সুপ্ত; শুধু পিতা নয়, তার প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ। শুক্রস্থিত জনন-কোষ (germ-cell) থেকে সন্তানের সমগ্র শরীর গ'ড়ে ওঠে, লক্ষ লক্ষ কোষের সৃষ্টিতে সন্তান-দেহের পুষ্টি হয়। এই জনন-কোষ নাকি অপরিবর্তিত অবস্থায় পিতা থেকে সন্তানে চ'লে আসে। সেই জন্যে কোন কোন লেখক বলেছেন,—"সন্তানের পিতাকে 'জনক' বা উৎপাদন-কর্তা না ব'লে বরঞ্চ জনন-বিন্দুর 'ট্রাষ্টী' বা রক্ষক বলা

উচিত।” মতটি অভিনব বটে। জার্মান পণ্ডিত **ওয়াইজ-ম্যান্** এই মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। অনেকে ভাবেন, সন্তান পিতৃগুণের উত্তরাধিকার পায় এই জনন-বিন্দুর গুণেই। এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আমরা বরঞ্চ বল্‌তে পারি, বংশের বিস্তার, অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহের মন-প্রকৃতির সন্তানে সঞ্চরণ, একটিমাত্র জনন-বিন্দুর ক্রম-পরিণতিতে নয়, একই প্রকারের জনন-কোষের ক্রিয়ার ফল। এখন প্রশ্ন এই, বিন্দু-ক্ষরণ একই প্রকারে ঘটে কি ক'রে? ভ্রূণে যে জনন-কোষ আছে, শিশুর দেহ-মনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তার ক্ষয় হয়। সন্তানোৎপাদক জনন-কোষ কৈশোরের পূর্বে বড় আসে না। সুতরাং ওয়াইজ্‌ম্যানের কথা ধ'রে বংশানুক্রমের সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

বংশানুক্রমের রক্ষণশীলতা **'মেণ্ডেলের আইনে'** বাঁধা পড়েছে। **মেণ্ডেল** দুই জা'তের মটরশুঁটি এক সাথে ক'রে গাছ জন্মিয়েছেন। কতকগুলির গাছ লম্বা, কতক বেঁটে। এই সব গাছে পাওয়া মটরশুঁটিকে আবার বর্ণসঙ্করের ধারায় এক সাথে ক'রে মাটিতে গে'ড়ে ও বিশেষ যত্ন ক'রে লালন-পালন ক'রে—গাছ ও ফলের (অর্থাৎ বীজের) হ্রাস-বৃদ্ধির ক্রম লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। তাঁর প্রথম বারের পরীক্ষায়, অর্থাৎ বড় ও ছোট জা'তের একত্র চাষে, তিনি পেয়েছেন লম্বা-ধরণের মটরশুঁটি। সবগুলিই ছিল লম্বা। যেন বড়গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোটগুলি পিছিয়ে গেল। দ্বিতীয় বারে তিনি শুধু বড়গুলিরই চাষ কর্‌লেন। এই চাষের ফসল হ'ল—লম্বা ও বেঁটে—দুই রকমের মটর, তিনটি লম্বা, একটি বেঁটে—এই মাত্রায়। এর পরে তিনি শুধু বেঁটেগুলিরই চাষ ক'রে-দেখ্‌লেন—সব

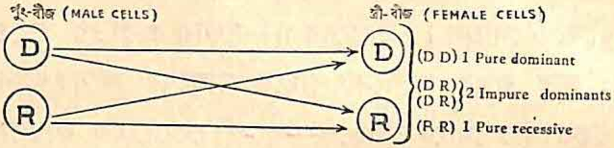
মটরই হ'ল বেঁটে জাতের। আবার অবশিষ্ট লম্বাগুলির পৃথক আবাদে—বিস্ময়কর ফল পেলেন ; এই বারের ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হ'ল লম্বাটে, দুই-তৃতীয়াংশ হ'ল দু'রকমের—পূর্বের ৩ : ১ মাত্রায়। যেখানে শুধু লম্বা বা শুধু বেঁটের চাষ, সেখানে বংশ-ধারা পবিত্র বা অক্ষুণ্ণ ; যেখানে বর্ণ-সাঙ্কর্য্য, সেখানে অপবিত্র বা ক্ষুণ্ণ। দ্বিতীয় বারের চাষে তিনি প্রমাণ পেলেন, শতকরা পঁচিশটি বেঁটে (অক্ষুণ্ণ), পঁচিশটি লম্বা (অক্ষুণ্ণ) এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশটির সবই লম্বা, কিন্তু ক্ষুণ্ণ। বিশেষজ্ঞগণ লম্বাগুলিকে নাম দিয়েছেন dominant, বেঁটেগুলিকে নাম দিয়েছেন recessive, খাঁটি বা অক্ষুণ্ণ বংশধারা pure, এবং বর্ণ-সাঙ্কর্য্য-জাত মটরগুলি ক্ষুণ্ণ—impure। নিম্নস্থিত নক্সাটি থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।



নক্সাটি রস সাহেবের বই থেকে নেওয়া। এই নক্সাটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, অক্ষুণ্ণ বংশের উৎপন্ন বীজ অক্ষুণ্ণ, আর সেগুলি লম্বা ও বেঁটে, শতকরা পঁচিশটি। মেণ্ডেল সাহেব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ক'রে এই সত্য আবিষ্কার ক'রেছেন। উদ্ভিদ্ ছাড়া, ক্ষুদ্র জন্তুর বেলাতেও তাঁর পরীক্ষা চ'লেছিল। উদ্ভিদের গর্ভ-সঞ্চার প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া ; ক্ষুদ্র জন্তুর সন্তানোৎপাদনে মানুষের অনেকখানি হাত। ধেড়ে ইঁদুর আর নেংটে ইঁদুরকে—পুং-স্ত্রী ভেদে এক জায়গায় রেখে সন্তান উৎপাদন করতে দেওয়া হয়। এখানেও "মেণ্ডেলের আইন" প্রমাণিত হ'য়েছে। ধেড়ে ও নেংটের জন্মের অনুপাত ঠিক মটরশুঁটির অনুপাতের অনুরূপ হয়েছে।

"Pure gametes", অর্থাৎ নিখুঁত জনন-বীজ—জীব ও মানবের দেহে যদি পৃথক্-কৃত বা অসম্পর্কিত হয়ে সংরক্ষিত হয়, তাহ'লে পিতামাতার দোষ-গুণ সন্তানে বিসর্পিত হয়। কি অনুপাতে তা হয়, মেণ্ডেল্ তার তালিকা গড়েছেন। শুক্র-শোণিতের সম্পর্ক যখন ফলপ্রসূ হয়, অর্থাৎ পুং-বীজ স্ত্রী-বীজের ক্ষেত্রে সন্তানকে সম্ভাবিত করে, তখন কতকগুলি পরীক্ষিত নিয়ম মেণ্ডেল লক্ষ্য ক'রে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। লম্বার সাথে লম্বার মিলনে—সন্তান হয় লম্বা—নিখুঁত। বেঁটের সঙ্গে বেঁটের মিলনে—সন্তান হয় বেঁটে—নিখুঁত। লম্বার সাথে বেঁটের মিলনে—সন্তান হবে লম্বা, কিন্তু বর্ণ-সঙ্করের ত্রুটি থেকে যাবে। বেঁটের সঙ্গে লম্বার মিলনে সন্তান হবে লম্বা, কিন্তু অক্ষুণ্ণতা থাকবে না। যৌন-তত্ত্বের এই নিগূঢ় রহস্যকে উদ্ভেদ করতে গেলে—নূতনতর পরীক্ষার প্রয়োজন। নৃ-তত্ত্বের ও জনন-

শাস্ত্রের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের খবর শিক্ষা-বিজ্ঞানকে নিতে হবে। Thomson ও Geddes-এর "Evolution"-নামক গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে রস (Ross) সাহেব আর একটি নক্সা এঁকেছেন। সেটি নীচে অবিকল দেওয়া হল।



মেণ্ডেলের আইনে মানুষ ও পশুর সমান স্থান। মানুষ ও পশুর মধ্যে দাপট্ যাদের বেশী তাদেরকে বলা যায় Dominant, মৃদু প্রকৃতি যাদের তারা Recessive। বিবর্তনের প্রসাদে কোন্ শিক্ষার্থী কোন্ কোন্ দোষ-গুণ বংশ-ক্রমে বহন কর্‌ছে, তা জান্‌তে পারলে শিক্ষা-ব্রতী শোধন-কার্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারেন। বংশানুক্রম ও বিবর্তনবাদের আলোচনার প্রধান কারণ বা উদ্দেশ্য একটি চিরন্তন পরীক্ষা। মানুষের জীবনে—তার স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও শক্তিই বড়, না শিক্ষা ও পরিবেষ্টনের প্রভাব বড়—এই দ্বন্দ্বের সমাধান আজও হয় নি। অশিক্ষিত সাধু আর শিক্ষিত পশু—আগেও ছিল, এখনও আছে। তেঁতুল-গাছে আম ফলে না, অর্থাৎ রক্তে গলদ্ থাক্‌লে—হাজার শিক্ষাতেও কোন কোন লোক শুধ্‌রায় না। এই মতের পোষকদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বল্‌বার অনেক আছে। গাধাকে ঘোড়া বানান অসম্ভব, একথা যেমন ঠিক, গোবোরে পদ্মফুল ফোটে, একথাও তেমনি ঠিক। প্রকৃতির খেয়ালই বড়, না তার নিয়মাধীনতা বড়—এর জবাব মানুষ যুগে যুগে দিয়েছে,

দিবেও। অপরাধ-বিজ্ঞান (criminology) শিক্ষা-বিজ্ঞানীর মনে যদি নৈরাশ্যের সঞ্চার করে, তবে সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়্বে। সেই জন্যেই Dr. F. H. Hayward-এর "Education and the Heredity spectre"—এ বিষয়ে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বংশ-ধারার বিষক্রিয়া যদি নিতান্তই দুরপনেয় হয়, তা'হলে আমাদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা অতলে নিমজ্জিত হবে। যে সুদীর্ঘকালের প্রাণ-শক্তির প্রেরণায় মানুষ উদ্ভিদজীবনের আস্বাদ গ্রহণ ক'রে, প্রাণি-জীবনের স্তরে স্তরে পদক্ষেপ করেছে এবং বিবর্তনের প্রত্যন্ত-দেশে পৌঁছে মেধা ও প্রজ্ঞার আলোকে নিজের ও অন্যের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত ক'রেছে—তার তুলনায় তার সভ্যতার ইতিহাস অতি অল্পকাল স্থায়ী। প্রাচীন ভারত, মিশর, চীন—আপন আপন আদর্শে মানুষ গড়্তে গিয়ে দেখেছে—জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়-সাধন সকল শিক্ষার সার। নিঃশ্রেয়স-লাভের সহায় নৈষ্কর্ম্য; কিন্তু কর্ম ব্যতিরেকে নৈষ্কর্ম্য আসে না। আবার, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ না হ'লে কর্ম মানুষের কণ্টক-স্বরূপ হয়। সেই কর্মগত শিক্ষার সুর নূতন ক'রে শুন্তে পাচ্ছি—বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাবে, ভারতে ও ভারতের বাইরে। যদি heredity বা বংশ-ধারা শিক্ষা-পথের কণ্টক অথবা বিভীষিকা হয়ে পড়ে, তা'হলে সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের সাধকগণ অবসর গ্রহণ করতে পারেন। ফল কথা, এ তত্ত্বটি বড়ই চিত্তাকর্ষক; আমরা কিছু বিশদ আলোচনা আরম্ভ কর্ব।

আরম্ভ করবার আগে অপ্রাসঙ্গিক দু'একটি কথা বলবার আছে। সমাজ-জীবনের দেহ পৃথিবীর সর্বত্র গ্রামাঞ্চলেই থাকে; মস্তিষ্ক

থাকে নাগরিকের গোষ্ঠীতে। অথবা, গ্রাম্যজীবনকে যদি বলা যায় দুধ, নাগর-জীবন তার ননী। বিংশ-শতাব্দীতে যদিও উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার স্ফীতি অতিমাত্রায় দেখা দিয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপে গান্ধী-বাদ নূতন তত্ত্ব, নবতর সামাজিক স্বাস্থ্য, ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, তবুও একথা ঠিক নাগরিকতার আবেষ্টনেই মানুষ যুগে যুগে আত্মবিকাশের সবচেয়ে বড় সুযোগ পায়। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' দেখতে পাই, নাগরক'-গণ শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কার ও আচরণে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের ভারতবাসী হয়েও—ঠিক একালের সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর মত জীবন যাপন করত। তাদের পরিচ্ছদ, গন্ধানুলেপন, ধূপদান, অলক্তক-রাগ, 'ফেনক' অর্থাৎ সাবানের ব্যবহার, তাদের স্নানাগার, উদ্যান-বাটিকা, সুরা, মধু ও আসব-পানের ঘটা, তাদের 'গোষ্ঠী' অর্থাৎ প্রীতি-সম্মেলন, তাদের শিল্প ও সাহিত্য-সংসদ্, তাদের মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা, অথচ গৃহ-ব্যাপারে সংযম—আমাদের এই কথা মনে করিয়ে দেয় যে শিক্ষার পরিবেষ্টনে সংস্কৃতি ও সভ্যতা খুব বড় জিনিস। সরস্বতীর মন্দিরে প্রতি পক্ষে পূজা হ'ত এবং নিয়মিতভাবে নাগরকগণের 'সমাজ' বস্‌ত। এই উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা হ'ত, তাতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমানাধিকার থাক্‌ত। এই শোভাযাত্রায় প্রেমিকা-নির্বাচনের উপযুক্ত অবসর বা সুযোগ মিল্‌ত। স্বামীর অনুমতি নিয়ে বয়স্কা মহিলারাও শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন। 'গণিকা'-গণ সাহিত্য ও কলার কস্‌রতে আপন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ক'রে সম্মানার্হা হ'তে পার্‌তেন। গোষ্ঠী ও কলার মিলন-ক্ষেত্রে অবিবাহিতা মেয়েরা যোগ্যতা দেখালে বিশেষ প্রশংসা লাভ কর্‌ত।

"উদ্যান-যাত্রা", অর্থাৎ বাগান-বাড়ীতে ভোজের আয়োজন মাঝে মাঝে করা হ'ত। অবিবাহিত, এমন কি বিবাহিত মেয়েরাও এই রকমের বন-ভোজে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কর্‌ত। কোন কোন অনূঢ়াকে এই অবসরে দুষ্ট লোকে বিবাহের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে যেত।

এই রকমের সমাজ যেখানে মঞ্চ, সেখানে শিক্ষার অভিনয় ভাল রকমেই হ'ত। গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা 'শাস্ত্র'-গ্রহণ না কর্‌লেও শাস্ত্রের শাণে তাদের বুদ্ধি হ'ত ক্ষুর-ধার। 'প্রতিমালা' অর্থাৎ কবিতা-দ্বন্দ্বে তাদের শিখ্‌তে হ'ত বহু উৎকৃষ্ট কবিতা ; স্মৃতিতে বহন কর্‌তে হ'ত সেগুলি। পুরুষদের বিদ্যায়তনে বিদগ্ধ-জনের গঠন হ'ত সমাজের অনুকূলে। অথচ কুলাঙ্গার বা প্যাপণ্ডের সংখ্যাও কম ছিল না। নাগরিকতার সুফল ও কুফল সমভাবেই সমাজ-দেহে রস-সঞ্চার করত। সুতরাং প্রাচীন ভারতেও প্রশ্ন ছিল একই, কোন্‌টা বড়, শিক্ষার পরিবেশ, না বংশানুগতি। শিক্ষাব্রতীর কাছে বড় একটি ধাঁধা এই, নিম্নলিখিত বিষয় দু'টির কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য এর মীমাংসা। "যোগ্যতমের বিবর্তন" যদি মেনে নেই, তাহ'লে অযোগ্যদের স্থান কোথায়? অযোগ্যরা শিক্ষা-পরিবেশের সুফল ভোগ ক'রে ধীরে ধীরে যোগ্যতার অর্থাৎ টিঁকে থাকার দিকে অগ্রসর হবে কিনা? জীবন-সংগ্রামে অযোগ্য যদি পিছিয়েই যায়, যদি নূতন নূতন শিক্ষা-পরিমণ্ডলের সুবর্ণ-সুযোগ গ্রহণ কর্‌তে অসমর্থ হয়, তবে কি প্রতি যুগে শিক্ষা-ব্রতীকে নূতন ক'রে অসভ্য মানুষকে পিটিয়ে সভ্য করতে হবে? শিক্ষালয়ে অভ্যস্ত নবার্জিত গুণগুলি

মানুষের বংশানুক্রমে থেকে যায় কি? পক্ষান্তরে, আমরা বিশ্বাস করি, প্রতি মানব-শিশুর মনুষ্যজাতিকে দেবার মত কিছু-না-কিছু আছে; শিক্ষা তার এই দানশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাকে প্রস্তুত ক'রে তুল্‌বে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই, নিম্নতম মঞ্চ থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম বেদী পর্যন্ত, মানবকে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়—পিতার যুগ থেকে পুত্রের যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ বংশপরম্পরায় এবং কালক্রমে। এই মতটি প্রধানতঃ **ল্যামার্কের**। একে বলা যেতে পারে **নব-ডারউইন্ তত্ত্ব**। এ সম্বন্ধে রস্ (Ross) বলেছেন, "শিক্ষালয়ে ও শিক্ষা-পরিবেশে লব্ধ সংস্কারগুলি পিতা-মাতা থেকে সন্তানে সংক্রমিত হয় না, এ কথা বলা চলে না; যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁদের মত যুক্তিসহ নয়।" মানুষ অবস্থার দাস নয়। অবস্থা বা পরিবেষ্টনের সঙ্গে সে নিজকে যেমন খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তেমনি পরিবেষ্টনকেও নিজের আদর্শের অনুরূপ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে ও তোলে। সুশিক্ষা বল্‌তে আমরা এই বুঝবো—শিক্ষা-লাভের পরিণাম স্বরূপে মানুষ, ব্যষ্টি ও সমাজ-গত জীবনে, দিনের পর দিন নব-তর শক্তি লাভ কর্‌বে এবং অর্জিত সংস্কার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর ক'রে তুল্‌বে।

শিক্ষা-ব্যাপারে বিবর্তন-তত্ত্বে একটি মজার কথা আছে। এই মতবাদকে বিশেষজ্ঞগণ নাম দিয়েছেন **'পুনরাবৃত্তি'** (Recapitulation)। এতে বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ, কি নর, কি নারী, সমগ্র মানব-জাতির ধারাবাহিক বিবর্তনের পুনরাবৃত্তি নিজের জীবনে করে। জাতিগত জীবনের প্রতিচ্ছায়া ব্যষ্টি-জীবনে প্রতিফলিত হয়।

পণ্ডিতরা বলেন, মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ নাকি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জীবের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, যদিও বিবর্তনের সময় ও ধারা খুব সংক্ষিপ্ত। আবার, জাতক ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে পরিণত বয়স অবধি—ঐ সকল স্তরের পুনরভিনয় করে। অর্থাৎ দেহের পুষ্টি যেমন নানা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চলে, মনের গঠনও তেমনি নানা পর্যায়ে ও স্তর-বিন্যাসে দৃঢ় হয়। মানুষ যেমন নিম্নতম জীবের উন্নততম সংস্করণ, মানুষের মনও তেমনি শৈশব থেকে বার্ধক্যে আস্তে আদিম যুগের ন্যাংটা মানুষের মনোভাব, মধ্যযুগীয় মানুষের কিঞ্চিৎ-উন্নত সভ্যতার ও পরবর্তী কালের সর্ববিধ উন্নতির পরিচয় দেয়। বর্বর-যুগের মানুষ খেল্না ভালবাস্ত, উজ্জ্বল রং, সাজগোজ পছন্দ কর্ত, এবং বিশেষ ক'রে প্রবৃত্তির প্রেরণায় চল্তো। এ-যুগের শিশুরাও ঐগুলি চায়। এ কথাটি নিছক্ উপমা নয়; এর ভিতরে অনেকখানি কঠোর সত্য নিহিত আছে। হার্বার্ট্ স্পেন্সার ও ষ্টান্লি হল্—এই উপমার উপর খুব জোর দিয়েছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই উপমা স্মরণে রাখ্লে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যায়। জার্মান মনীষী গেটে লিখেছেন,*—"দুনিয়ার লোক, মোটের উপর অগ্রগতিশীল হলেও, যুবককে শুরু কর্তে হয় শুরু থেকে, তাকে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবগুলি ধাপই অতিক্রম কর্তে হয়।" হেগেলও ঐ কথা স্বীকার করেছেন—বিদ্যায়তনের সীমানার মধ্যে বিদ্যার্থীর শিক্ষা-ব্যাপারে। হার্বার্ট্ স্পেন্সর

* "Although the world in general advances, the youth must always start again from the beginning and as an individual traverse the epochs of the world's culture."
—Goethe.

লিখেছেন,†—"ঐতিহাসিক-এর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখা যায়, সমগ্র মানবজাতির শিক্ষা যে প্রণালীতে চলেছে, শিশুর শিক্ষা ঠিক একই প্রণালীতে চল্‌তে বাধ্য।"

সুতরাং শিশুকে খেলাচ্ছলে শিখিয়ে তুল্‌তে হবে—আনন্দের আবেষ্টনীতে। শিশুকে পূর্ণ-বয়স্কের মত মনে ক'রে শুধু তাকে শুষ্ক নীতি-কথার অনুকারী ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে গুরুতর ভুল করা হবে। শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবন-কাল পর্যন্ত মনো-গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব রাষ্ট্রপালকের দায়িত্ব অপেক্ষাও সুকঠিন। এ যেন একটা বিরাট্ এবং গূঢ় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আবর্ত এবং আবর্তন। একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ শিক্ষার্থীর জীবনকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। শিশুর শৈশব তার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। বাল্য—ছয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত। কৈশোরের সীমা-রেখা তার আঠারো বছর বয়সে। তারপর আসে পূর্ণ-বয়স্কতা। তিনি বলেন, এই চা'র অবস্থার মধ্যে—কৈশোরের পূর্বকালেই মানুষ, অর্থাৎ মানব-শিশু, পূর্ণ-বয়স্কতার আভাস পায় ও সেই রকমের আচরণ দেখায়। কৈশোরে পৌঁছে যেন তার শৈশব আবার ফিরে আসে; তখন সে কি-যেন হারানিধি খুঁজে বেড়ায়, শৈশবের বিস্ময়াবেশ তাকে পুনরায় চঞ্চল ক'রে তোলে। পূর্ণ যৌবন এলে এই চঞ্চলতার তরঙ্গ নিস্তেজ হয়; তখন সে বাল্যের, বার্ধক্যের, অর্থাৎ স্থিতধীত্বের, পুনরাস্বাদ গ্রহণ করে। বাল্যের বার্ধক্য বল্‌তে এখানে আমরা

† "The education of the child must accord both in mode and arrangement with the education of mankind—considered historically."
—Herbert Spencer.

বুঝবো শৈশবের বিস্ময়াবহ চঞ্চল গতি-মতির সাময়িক স্থিরতা। তারপর যৌবনোদ্গমের স্রোতোবেগ কৈশোরে তরঙ্গিত হয়। সুতরাং এই বিজ্ঞানীর মতে—কৈশোর শৈশবের পুনরাবৃত্তি, যৌবন বাল্যের পুনঃ-প্রাপ্তি। শৈশব ও বাল্যকে এক বন্ধনীতে, এবং কৈশোর ও পূর্ণযৌবনকে ভিন্ন বন্ধনীতে ফেলে আমরা মোটামুটি তু'টি ভাগ ক'রে থাকি। ইনি বলেন, শৈশব ও কৈশোর পড়ুক এক ব্র্যাকেটে ; বাল্য ও যৌবন, ভিন্ন ব্র্যাকেটে। যৌন-বৃত্তির উদ্গম কৈশোরে হয় ব'লে—এ রকমের দৃষ্টি-ভঙ্গী বেশ যুক্তি-সহ। কিন্তু, তিনি বলেন, যৌন ব্যাপার ছাড়া অন্য সকল রকমের আচরণেও—এই নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থকতা আছে। ছেলেদের মানস-শক্তির পরীক্ষায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

শিশুদের শারীর ও মানস বিবৃদ্ধি সমান্তর গতিতে চলে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই বিকাশ চলে জলের ঢেউয়ের মত। মনে হয়, যেন প্রকৃতি শিশু-মনের খানিকটা জোরে চালিয়ে নেয়, আবার খানিকটা অবসর দেয়, বা নেয়। ঐ অবসর কালে বিকশিত বৃত্তিগুলি সংস্থিত ও সংহত হয়। জন্মের পর—তিন বৎসর অবধি শিশুর দেহ ও মন খুব দ্রুতগতিতে বিবৃদ্ধি-লাভ করে। ঐ অবস্থারই রোমন্থন চলে—ছয় বা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত। এর পরের গতি খুব দ্রুত হয়। আবার তার পর আসে সাময়িক স্থিতি। এই অবস্থার নাম বাল্য। দশ এগার বছরের বালক যেন অনেকটা পূর্ণবয়স্কের মত জগতের সঙ্গে সহজ বোঝা-পড়া ক'রে নিতে শিখে। এই স্থৈর্যের বাঁধ আবার ভেঙ্গে যায় কৈশোরের অভিঘাতে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, বাল্যের এই সুস্থিত অবস্থার মধ্যে বহু

প্রাচীন যুগের প্রাক্-মানব যুব-জানোয়ারের ক্ষয়িষ্ণু, অথচ সহিষ্ণু জীবনের প্রতিকৃতি যেন আলেখ্যের মত প্রতিবিম্বিত হয়। এই জীবের বিবর্তিত পরিণাম—মানুষ। বাল্যের সহজ বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হয়—কিশোর বয়সে। আবার তারা ফিরে আসে প্রাপ্ত-বয়স্কের মনোরাজ্যে। বাল্যের এই স্থিতাবস্থায় বালকের মন হয় বহির্মুখ (extrovert) ; শৈশবে তা ছিল অন্তর্মুখ (introvert)। বাল্যে সঙ্গ-লিপ্সা হয় প্রবল। জিজ্ঞাসার তাগিদ কিছু কালের জন্যে ক'মে যায় ; আর দশ জন বালকের সঙ্গে মিশে সঙ্ঘ-প্রিয়তা প্রদর্শন করে ; মাতা-পিতার অনুশাসনে আবদ্ধ থাক্‌তে চায় না ; নিজেদের জগতে মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে থাক্‌তে ভালবাসে ; দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনে স্থান বড় পায় না। দলগত স্বার্থকে নিজের স্বার্থ মনে করে। দলীয় বিরোধ মাঝে মাঝে ঘটে। তখন দরকার হয় কারও মধ্যবর্তিতা। শিক্ষক হ'তে পারেন সে স্থলে উৎকৃষ্ট "লিয়েসন্ অফিসার।" বাল্যের পূর্বে শিশু ছিল স্বয়ং-সিদ্ধ, নিজের জগতে নিজে মশ্‌গুল ; সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা ; বিস্ময়ের পুলকে বিহ্বল। কিন্তু বাল্য-বয়সে ছেলেরা যেন শিকারীর দল, স্বার্থত্যাগে এখনও অনভ্যস্ত। তাদের সমাজ-সচেতনতা জন্মেছে ; তবে তা নীহারিকার মত স্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। কিশোর-বয়সে আবার এসে যায় অন্তর্মুখীনতা। কিশোর বা কিশোরী আপন খেয়ালে চল্‌তে ভালবাসে ; মেজাজের সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে ; আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠে ; কথায় কথায় লজ্জায় রাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। যৌন-বৃত্তির উন্মেষ হয়। এক কথায়, দ্বিতীয় শৈশব ফিরিয়ে পায়। **পুনরাবৃত্তি-তত্ত্বের** (Recapitulation theory)—এই একটি বিশিষ্ট রূপ।

এখন নব-ডারউইন্ এবং পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব বাদ দিয়ে বিবর্ত্তন-বাদের গোড়াকার কথায় যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, ইউরোপে, ডারউইনই প্রথম বিবর্তনবাদের গোড়া-পত্তন কর্‌লেন। ল্যামার্কের মতের বিরুদ্ধে **ডারউইন্** প্রমাণ কর্‌তে চেয়েছিলেন, আবেষ্টনের প্রভাবে জীব-দেহেরই রূপান্তর হয়। ডারউইন্ জিরাফের দেহ-বিবর্ধনের ইতিহাস দিয়েছেন; জিরাফ্ নাকি প্রথমে চার ফুট উঁচু ছিল, উঁচু গাছের কচি পাতা খেতে গিয়ে তাকে গলা উঁচু কর্‌তে হয়; তাই ক্রমে ক্রমে উঁচু-গলা জিরাফ্ টিঁকে গেল। তিনি ধ'রে নিয়েছেন, জীবের জীবন-সংগ্রামের ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন ঘটে; পরিবর্তন বংশানুক্রমিক হয়; অযোগ্যের অবসান ও যোগ্যের অবস্থিতি—এই প্রক্রিয়ার ফল। প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ার মূলে; এর ইংরেজি নাম—natural selection; আর, যোগ্যতমের বিবর্তন বা (survival of the fittest)-এর পরিণাম। জীবের আকৃতি ও প্রকৃতিতে—নিঃশব্দে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা তু'রকমের। কতকগুলি ছোটোখাটো; কতকগুলি বড় রকমের। উভয়েরই মূল কারণ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট কথা কিছু বল্‌তে পারেন নি। তবে, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে,—তু'রকমের পরিবর্তনই বংশানুগতি লাভ করে; আর, এই ছোটো-খাটো পরিবর্তনের সমীকরণে নূতন নূতন জাতির বৈশিষ্ট্য (species) দেখা দেয়।

অপর কোন কোন বিজ্ঞানী আবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মূল্য দেন নি। তাঁরা বলেন, যে-সব জীব বা উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ রূপান্তর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, তাদের বেলায় পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বিবর্তনের ধীর-গতি এঁরা মানেন না। ল্যামার্ক্ বলেন, কোন জীবের

নূতন ক'রে পাওয়া অভ্যাস সন্তানে বিবর্তিত হয়। ওয়াইজ্ম্যান এই মতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন। তিনি অনেক ইঁদুরের ও তাদের সন্তানদের, কয়েক পুরুষ ধ'রে, ল্যাজ কেটে কেটে দেখেছেন, ল্যাজ্-কাটা ইঁদুর জন্মায় না ; ইঁদুর ল্যাজ নিয়েই জন্মায়। তাঁর যুক্তির প্রচণ্ডতার এই হ'ল হেতু। কিন্তু এখন সুর কিছু কিছু ফিরেছে। জীব-বিজ্ঞানীদের নূতন শাস্ত্রে নার্ভ্-তন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা শোনা যায়। আমরা সাধারণতঃ দেখ্তে পাই, লোহার কামারেরা হাতুড়ি পেটাতে পেটাতে দেহের উর্ধ্বাঙ্গকে লোহার মত শক্ত ক'রে তোলে ; যদি কামারের ছেলে—হঠাৎ বাবু না সেজে হাতুড়ি চালাতে পিছ-পা না হয়, তাহ'লে হয়ত দেখা যাবে, বাপ্কা-বেটারা বাবাদের ডিঙ্গিয়ে গেছে—শরীরের দৃঢ়-গঠনে। পাহাড়ীরা পাহাড় ডিঙ্গাতে গিয়ে পা-দুটোকে শক্ত শাবল বানায় ; বংশপরম্পরায় অভ্যাসের ফল দেখা দেয়। পাহাড়ে উঠ্বার উদ্যম বা শ্রম প্রথম দিক্টায় মাংস-পেশীকে যেন পিষিয়ে দেয়। পরের এক একটি পদক্ষেপ ধীরে ধীরে সহনীয় হয়। বাপ্-মায়ের অভ্যাস ছেলে-মেয়েতে চ'লে আসে। এই জন্যে মনো-বিজ্ঞানীরা একটি নূতন কথা সৃষ্টি ক'রেছেন—"Social heredity"। কোন পশু হয়ত একটি বিপদ্ দেখে পালায় ; এই পলায়ন অভ্যাসটি তার সন্তানেও থেকে যায়। পলায়ন-রূপ অভিজ্ঞতার স্তর-গঠন হয়। পূর্বে আমরা এর নাম দিয়েছি engram complex (প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়)। এইভাবে কোন জীবের instinct বা স্বভাবজ প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। আমরা আশা করতে পারি, কালক্রমে সভ্যসমাজে সঞ্জাত মানব-শিশুর instinct বিজ্ঞানীদের নব-লব্ধ সত্যকে প্রমাণিত

কর্‌বে। সেইজন্যেই শিক্ষাব্রতীকে মনোবিজ্ঞানের সাথে জীব-বিজ্ঞানের আলোচনা কর্‌তে হবে।

জীব-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা প্রজনন। ইউরোপে **ফ্রান্সিস্ গ্যাল্‌টন** এবং তাঁর মতাবলম্বিগণের চেষ্টায় Eugenics বা প্রজনন-বিদ্যার প্রচলন হয়। গ্যাল্‌টনের দল প্রমাণ করতে চান যে, মানুষের প্রকৃতিই প্রধান, শিক্ষা বা তার আবেষ্টন মূল্যহীন। জমজ সন্তানের উপর অনেক পরীক্ষা চালিয়ে, দু'জনকে দু'রকম শিক্ষা ও পরিবেষ্টনীর মধ্যে রেখে, তিনি সিদ্ধান্ত ক'রেছেন, বংশবীজ এদের জীবন ও চরিত্র-গঠনের প্রধান উপাদান। আবার, নান্ সাহেবের বই থেকে এ কথাও পাই, কোন এক জননী পাঁচটি সন্তান একবারে প্রসব ক'রেছিলেন ; এরা যখন বড় হয়, তখন এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়, অথচ জীব-বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী, এদের শারীর-বৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে অন্য একজন সাহেব গণনা ক'রে দেখেছেন, পাঁচ পুরুষে, অর্থাৎ শতাধিক বছরের মধ্যে, এক গোষ্ঠীর এক হাজার লোকের মধ্যে ৩০০ জনের শিশু-মৃত্যু ঘটে ; ৩১০ জন দীর্ঘকাল ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ক'রে অথবা মজুরের কাজ ক'রে কাটায় ; ৪৪০ জন রোগ-জীর্ণ হয়ে দুঃখময় জীবন যাপন করে ; ১৩০ জন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তার মধ্যে ৭ জন ছিল খুনী আসামী। মাত্র কুড়িজন কোন একটি ব্যবসায় শিক্ষা করে। সুতরাং বংশধারার অখণ্ড প্রতাপ অস্বীকার করার উপায় নাই। এদের সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়া অবশ্য হয় নাই। দিলে, ফল কি হ'ত বলা কঠিন। নান্ বলেন, এ একটি সমস্যা। তিনি হেল্‌ভেটিয়াসের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বিপরীত মতেরও আলোচনা

করেছেন। হেল্‌ভেটিয়াস্ বলেন, মানুষের ক্ষমতা, রুচি এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতার মূলে শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্নতা। কেবল ব্যক্তি কেন, একটা সমগ্র জাতকে শিক্ষাদানে উন্নীত করা সম্ভব; এমন কি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতীয় সত্তাকে বদ্‌লে দেওয়া যায়। জাপানের আধুনিকত্ব এবং জার্মানীর প্রুসিয়া-প্রভাব—এই ভাবের জাতীয় সামগ্রিক শিক্ষার ফল।

প্রজনন-সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞান অবরোহ-প্রথা অবলম্বন ক'রেছে। এ-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। গীতা বলেছেন,—

"সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবতি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

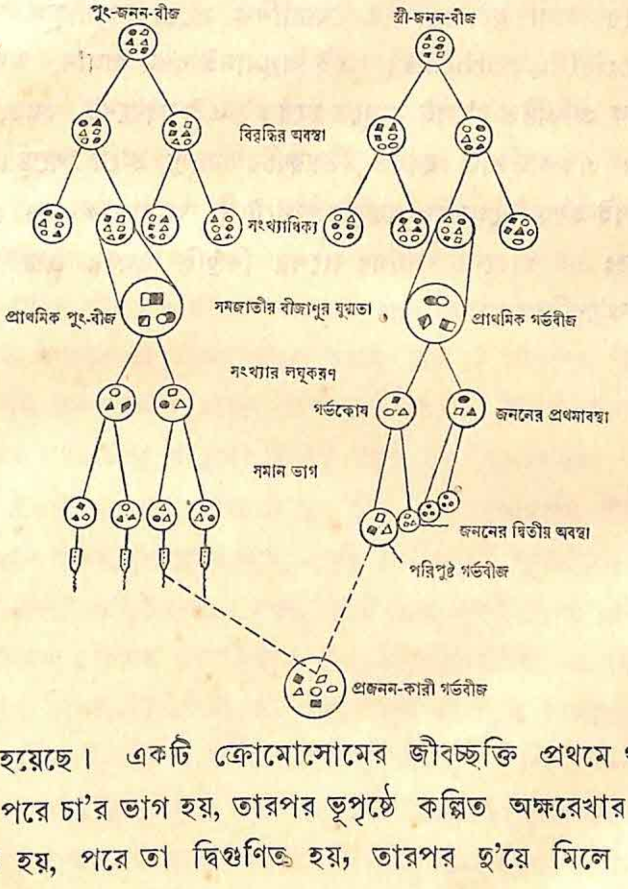
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বল্‌ছেন, "হে কৌন্তেয়, নিখিল জাতির মধ্যে যত রকমের আকৃতি দেখ্‌ছ, তাদের মূল একমাত্র প্রকৃতি এবং আমিই (ব্রহ্ম) তাদের বীজ-দাতা পিতা।" ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বলেছেন, "ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি"; অর্থাৎ বিশ্বাত্মিকা বিশ্বেশ্বরীর শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে। অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তিমাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীবসকল ঘটনাক্রমে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা নিঃশ্বাসবায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তা এমন অভিন্নভাবে পিতার আত্মার সাথে মিশে যায় যে তাদের পার্থক্য যেন একেবারেই নাই মনে হয়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষের যোগ হয়, তখন ঐ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হয়। তখন পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় ক'রে

মাতৃ-জরায়ুতে প্রকাশ করে এবং মায়ের দেহে বিলীন হ'য়ে যায়। পরে মা থেকেই দেহের পুষ্টি-সাধন হ'তে থাকে এবং তাতে ক'রেই সন্তানের জন্ম হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের বার্তা এমনি করেই বহন করেছে। মূল-প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। মানুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণের ক্রিয়াধীন। শিক্ষা মানুষের সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটায়। শুধু পরিবেষ্টন নয়, শুধু জ্ঞানের পরিবেশন নয়, আত্ম-সাধনায় অর্থাৎ আত্মিক বলেই সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। এই আশার বাণী ব্যক্তি ও সমাজকে সমভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল—প্রাচীন ভারতে। বংশের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও সেকালের সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা হ'তে পেরেছিল সম্পূর্ণ ডিমোক্র্যাটিক্। আমরা এখনও আদর্শ হাঁতড়াতে গিয়ে এসে পড়ছি "ক্রোমোসোম্"-তত্ত্বে।

পিটার স্যাণ্ডিফোর্ড্-এর নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখেছেন,—"By means of the factorial hypothesis we can easily explain the inheritance of quantitative characters and the existence of individual variations in man." অর্থাৎ, বংশ-বীজ-তত্ত্বের বিশেষ অনুশীলনের ও নানাবিধ পরীক্ষার ফলে আমরা অনায়াসে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি—মানুষ কি ভাবে তার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত এবং প্রবাহিত প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং কিরূপে প্রতি নর ও নারীর অন্য থেকে পার্থক্য এবং বিকাশের বৈচিত্র্য সম্ভবপর হয়। আবার আর এক জায়গায় লিখেছেন,—"The unit of inheritance is undoubtedly the gene of the chromosome." অর্থাৎ, বংশানুবর্তনের মৌলিক উপাদানকে "ক্রোমোসোম্"-

জনন বলা যায়। কোন উদ্ভিদ্ বা জীব-কোষের যখন ভাগ এবং পরিবর্ধন হ'তে থাকে, তখনই "ক্রোমোসোম্" পরিদৃষ্ট হয়। স্যাণ্ডিফোর্ড্ মর্গ্যান সাহেবের উদ্ধৃতি করেছেন এই—The sperm of every species of animal or plant carries a definite number of bodies called chromosomes. The egg carries the same number. Consequently, when the sperm unites with the egg, the fertilized egg will contain the double number of chromosomes. For each chromosome contributed by the sperm there is a corresponding chromosome contributed by the egg, i.e., there are two chromosomes of each kind which constitute a pair." এই উদ্ধৃতির সরলার্থ :—সকল রকম জীব ও উদ্ভিদের পুং-বীজের অভ্যন্তরে অনেকগুলি "ক্রোমোসোম্" থাকে ; স্ত্রী-বীজের অভ্যন্তরেও সমসংখ্যক 'ক্রোমোসোম্' আছে। যখন উভয় প্রকার বীজের অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম বংশবিতানবস্তুর সংমিশ্রণ হয়, তখন সগর্ভ স্ত্রী-বীজাণুর ক্রোমোসোম-সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়। এইভাবে পুং-স্ত্রী জনন-জীবাণুর জোড়া-বাঁধা সম্ভবপর হয়। মর্গ্যান্ সাহেবের ও তাঁর সহকারিগণের গবেষণার ফলকে আস্বাদন ক'রে সাধারণ পাঠকের পক্ষে রুচিকর করেছেন—পিটার স্যাণ্ডিফোর্ড্। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান্ নক্সা আছে ; এই নক্সাগুলি মনোযোগ ক'রে দেখ্লে—পাশ্চাত্য শুক্র-শোণিত-তত্ত্বের বা জনন-বিজ্ঞানের অনেকটা বুঝ্তে পারা যায়। প্রতি জীব ও উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে নির্দিষ্ট-সংখ্যক 'ক্রোমোসোম্' থাকে ; তার

অর্ধেক থাকে পুং-বীজে, বাকী অর্ধেক স্ত্রী-বীজে, বা গর্ভ-বীজে। মানব-দেহ-কোষে নাকি ৪৮টি ক্রোমোসোম্ থাকে, তার ২৪টি পুং-বীজে, বাকী ২৪টি গর্ভ-বীজে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় এই সংখ্যা



নির্ণীত হয়েছে। একটি ক্রোমোসোমের জীবচ্ছক্তি প্রথমে থাকে কেন্দ্রে, পরে চা'র ভাগ হয়, তারপর ভূপৃষ্ঠে কল্পিত অক্ষরেখার মত পার্শ্বগত হয়, পরে তা দ্বিগুণিত হয়, তারপর দু'য়ে মিলে এক হয়। উপরের চিত্রে পুং-স্ত্রী জনন-বীজের প্রক্রিয়া স্যাণ্ডিফোর্ড দেখিয়েছেন।

এই থেকে দেখা যায়, একটি ক্রোমোসোমের বিভিন্ন বংশ-বিতান-ব্যাপারে বিভিন্ন আচরণ দেখায়। এর প্রত্যেকটি অংশ মৌলিক উপাদান। এর ইংরেজি নাম gene বা factor। সেইজন্য গোড়ায় বলা হয়েছে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যের মূলীভূত অনুমান factorial hypothesis। এই অনুমানই যখন প্রমাণ, তখন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ব'লেই মান্‌তে হবে। এই কারণেই, হয়ত, জমজ সন্তান এক-গর্ভজাত হয়েও ভিন্নরুচির মনুষ্য হ'য়ে পড়ে। এই কারণেই হয়ত—গোবরে পদ্মফুল ফোটে না, আবার কখনও ফোটে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আর্যগণ বংশের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছিলেন।

ব্যবহারাবৃত্তি ও ক্রীড়াগতি

শিক্ষাব্রতীর নিকটে ব্যক্তি ও জাতির বিবর্তনের ইতিকথা—তার জ্ঞাতব্যের ইতি নয়, আরম্ভ। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি ক'রে তাকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে শিশুমন। শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে শিশুকে শিখতে হবে—ছ'টি মূল্যবান্ জিনিস। একটি অভ্যস্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ বাঁধা রাস্তা দিয়ে চলার প্রবৃত্তি-গঠন ; আর একটি, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা।

যম-নিয়ম জীবনের ছন্দ। মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্ ধুক্ শব্দ, তার শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠা-নামা তালে তালে চলে। মানুষের শরীর-যন্ত্রের এই ছন্দ অতি পুরাতন, অথচ চির-নূতন। অসভ্যের নাচ ও সভ্যতমের নৃত্য-কলা মানুষের একই প্রকারের ছন্দ-প্রীতির পরিচয় দেয়। একটি অসংস্কৃত, অপরটি সুসংস্কৃত এবং মূল্যমানে উন্নীত। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, শিশুদের মধ্যে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি তার জীবনের একটি বিশিষ্ট ছন্দ। একটি ছোট শিশু একই খেলা বহু বার খেলে, কেননা খেল্‌তে ভালবাসে। ওতে তার ক্লান্তি বা বিরক্তি আসে না। খেল্‌নার মোটর বা রেল-গাড়ী চালাতে চালাতে সে হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়ে। হারমোনিয়ামের একটা গৎ শিখ্‌লে—তার আওয়াজ বয়স্কদের কান ঝালা-পালা ক'রে—পাগল বানায়। আগ্‌ডুম-বাগডুম আর সূয্যি মামা ছোট ছেলে-মেয়েদের কানে সব সময়ে অমৃত বর্ষণ করে। লুকোচুরি খেলায় যে চোর হয়, সে সাধু হ'তে চায় না। গল্প শুন্‌তে বেলায় তাদের চাই—রাক্ষস আর

খোক্কোস, রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে—আর কোটালের ছেলে; নইলে গল্প রুচিহীন হয়। গানে চাই শেষ পংক্তির পুনরাবৃত্তি। ছেলেমেয়েরা দেখাতে চায়, তারা যা শিখেছে, তা তাদের সম্পূর্ণ অধিগত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাদের এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে বলা যায়—আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মপ্রচার। যে-কোন ব্যাপারের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে এই আত্মবোধ প্রকট হয়।

এক বা দেড় বছরের একটি শিশু—বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার নূতন-শেখা কথাগুলি আওড়ায়, এ কথা সকলেই জানেন। তারপর হয়ত সে ঘুমিয়ে পড়ে। কেন সে এমন করে? নিশ্চয়ই ভিতর থেকে আত্ম-প্রচার-প্রবৃত্তি তাকে খোঁচা দেয়। এর ফল হয় এই, দিনের পর দিন তার অভ্যস্ত কথাগুলি শক্ত গাঁথুনি পেয়ে তার মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং শিশু নিয়ে যে শিক্ষক কারবার করেন, তাঁকে শিশুর এই প্রকৃতি-দত্ত প্রবৃত্তিকে পুষ্ট হ'তে সহায়তা কর্‌তে হবে।

নান্ সাহেব শিশুর এই প্রবৃত্তির নাম দিয়েছেন—Routine tendency, বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে—**ব্যবহারাবৃত্তি**। ফলপ্রসূ শিক্ষায় শিশুর এই বৃত্তির উপর নির্ভর কর্‌তে হবে অনেকখানি; সুযোগও দিতে হবে তেমনি। কেউ কেউ মনে করেন, এই "রুটিনের" মধ্য দিয়ে চল্‌লে শিশুর স্বাভাবিক ধীশক্তি ব্যাহত হয়, একঘেঁয়েমির কুফল তার শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে না। এঁরা আধুনিক অগ্রগতির দলে; আবার, এঁদেরই কেউ কেউ ঠিক উল্টো কথা বলেন। তালিকা, "ফরমুলা" প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস তো করতেই হবে; সুর ক'রে, গান ক'রে, দশ জনে নাম্‌তা-পড়ার

মত পড়া শিখ্‌লে—শিশু-মনের স্মৃতি-স্তরগুলি খুব শীঘ্র ও স্বাভাবিক-ভাবে জমাট বেঁধে উঠে। পরে এই বাঁধা-ধরার পথ থেকেই বেরিয়ে আসে তাজা মন, নূতন সৃষ্টির উদ্যম নিয়ে। প্রাচীন-পন্থীরাও মুখস্থ করাতেন,—আধুনিকেরা চান—ছড়া মুখস্থ করবার আগে ছেলে যেন বিষয়টি বেশ বুঝতে পারে এবং দরকার হ'লে ছড়া বানাতে পারে। আর, "ফরমুলা" শিখ্‌বে পড়ার শেষে, অর্থাৎ বিষয়টি হজম করবার পর। আগে-ভাগে বুলি আওড়ালে হবে তো তোতাপাখী। গণিতের শিক্ষক ভাল করেই জানেন, ছেলে আঁক যত কর্‌বে এবং যত বেশী বার কর্‌বে—ততই হবে সে নির্ভুল। নির্ভুল হ'তে পারলে শিশুর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর হবে। যাঁরা কেবলই আতা, কমলালেবু বা হাতী-ঘোড়ার আব্‌ডালে শিক্ষার্থীর সংখ্যাবোধ জাগ্রত করতে চান এবং শ্রেণীতে প্রদত্ত পাঠকে নিতান্ত মনোজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার অবসর আছে।

ব্যালার্ড্‌ সাহেবের গণিত-শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থে দেখ্‌তে পাই, অযথা সময়-সংক্ষেপের অজুহাতে একটি কাঁচা ও কচি ছেলেকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঠেলে নিয়ে গেলে, সে নিজেই হয়ত বিগ্‌ড়ে গিয়ে আপত্তি জানাবে। সে চাইবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, ধাপে ধাপে, সহজ থেকে কঠিনে উত্তরণ। শৃঙ্খলা-বোধ শিশু-মনের একটি সহজাত বৃত্তি। শিক্ষাবিদের তা জানা উচিত।

পাঠ-সূচী বা time-table সম্বন্ধে অনেক উগ্র আধুনিক উত্যক্ত। তাঁরা ও জিনিসটাকে আমলই দিতে চান না। তাঁরা বলেন, ভূগোল পড়াতে গিয়ে, প্রসঙ্গতঃ আন্‌তে হবে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, সাহিত্য। তূলা পিঁজ্‌তে গিয়ে যদি তার আঁশগুলি

একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যায়, তাহ'লে যেমন তার বাঁধন না থাকায় টেকোতে গিয়ে পাক ধরবে না, সময় ও কথার বাঁধনে বিষয় বাঁধা না পড়লে—তা শিশু-মনের উপরে টানা-পোড়েন ফেল্বে না। তবে পাঠ-সূচী এমন ভাবে তৈরী হওয়া চাই, যাতে শিশুর সৃজনী-শক্তির ব্যাঘাত না জন্মায়। পরিপক্ক শিক্ষকের কাছে পাঠ-সূচী হবে একটি যন্ত্র বা উপচার।

এই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে নান্ সাহেবের কথাগুলি হয়ত ভাল লাগ্বে না। শিশুর নিকটে কতটুকু পরিবেশন কর্তে হবে—একটি বিষয়-সূত্র অবলম্বন ক'রে, প্রাসঙ্গিকতার সীমানা কতখানি সহজ-বোধ-গম্য ও শোভন অর্থাৎ সময়োপযোগী হবে, তা নির্ণয় করা, ও দৃঢ়তার সঙ্গে উক্ত বিষয়ে পরিচালিত ও নিবিষ্ট করা, শিশু-মনের স্বচ্ছন্দ গতি ও স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখা—অতি কঠিন কাজ। একটি সদ্যঃ-প্রস্ফুট, তাজা, কোমল শিশু-মনের পক্ষে নিম্নলিখিত দু'টি প্রণালীর কোন্টি বেশী কাজের, তার পরীক্ষা এখনও চল্ছে। হয়ত একখানা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে শিক্ষক সুরু কর্লেন বিদেশের কথা; দেশের সম্বন্ধে শিক্ষার্থী শিশুর জ্ঞান কতটুকু, তখনই তার যাচাই দরকার হ'ল; নক্সা ও ছবি দেখিয়ে তার স্কুল, বাড়ী, পাড়া, গ্রাম, থানা, মৌজা, ইউনিয়ন, মহকুমা, জেলা ও দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বল্তে হ'ল; দেশ ও বিদেশের প্রসঙ্গে দেশী ও বিদেশীর বিভিন্নতা নানা ইঙ্গিতে বোঝাতে হ'ল; অথচ, তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাক্ল মানুষের অভিন্নতার, কালো, সাদা, তামাটে ও পীতের—গোষ্ঠীগত ঐক্য ও অনৈক্যের; আবার, ঠিক সেই সঙ্গে chronology বা কাল-ক্রমের

বৈষম্য না ঘটিয়ে মানুষের অভিযানে ইতিহাস, তার সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের প্রযত্ন, সাফল্য ও পরাভব, সংঘাত ও সম্মেলন বর্ণিত হ'ল। তার পর কথার জাল গুটিয়ে শিক্ষক আনবেন সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের বৈদেশিক ঘটনার কিংবা ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ হ'ল বোমা ও বিমানের ; আন্‌তে হ'ল বিমানের জন্ম-কথা ; অবতারণা কর্‌তে হ'ল পুষ্পক-রথের কথা, দশাননের লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য ও সমরাভিযানের কথা ; ভারতের লুপ্ত বিজ্ঞানের এবং ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের কথা। গাছের তলায় বসেই হোক্ আর স্কুল-ঘরের ছাদের নীচে বসেই হোক্—শিক্ষক প্রত্যেকটি শিশুর মনকে সমভাবে টেনে ধ'রে কতক্ষণ রাখ্‌তে পারবেন ? তাঁর সময় ও শক্তির 'বাজেট্' অতিক্রান্ত হবে না কি তাতে ? ব্যক্তি ও শ্রেণীকে শিক্ষক একই সঙ্গে কুক্ষিগত কর্‌তে পারবেন কি ? শ্রেণী-গত শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তিগত শক্তির সম্প্রসারণ, এবং এই উভয়ের মধ্যে শিক্ষকের সঞ্চরণ-শিক্ষা-বিজ্ঞানে যে সমস্যার উদ্ভব সম্ভবপর ক'রে তোলে, তার নিরাকরণ নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের আলোচনা এবং পরীক্ষার উপর। শ্রেণীই হোক্, আর একটি শিক্ষার্থী হোক্, শিক্ষকের কাজ হবে তার বা তাদের সুপ্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশের সহায়তা। এই সহায়তার ব্যাপারে—শিক্ষক যতখানি দিবেন, তার চেয়ে বেশী ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করবেন। এই আদায় হবে লাঠির ভয়ে নয়, ভালবাসার মাদকে এবং যোগ্যতার প্রয়োগে। সময়সূচী হবে শিক্ষকের হাতে একটি অমোঘ ঔষধ ; তিনি, এই বস্তু অবলম্বন ক'রে এবং ছেলেদের ও-র মধ্যদিয়ে চালিয়ে, তাঁর বক্তব্য এবং কর্তব্য দু'য়েরই প্রয়োগ

করবেন। সময়-সূচী ছাড়া শৃঙ্খলা আনা যায় না, এ-মতকে পুরাতন ও অচল ব'লে উপেক্ষা করা চলে না।

শিশু যখন বাঁধা-ধরা নিয়মে বাঁধাবাঁধি সময়ের ভিতরে লেখা-পড়ার কাজ করে, তখন কাজ হয় বড়; আবার যখন সে বাঁধনের বাইরে এসে মুক্তির স্বচ্ছন্দতায় আপন খেয়াল মত খেলা-ধূলায় মেতে উঠে তখন খেলা হয় বড়। স্বচ্ছন্দতা খেলা-ধূলার প্রাণ; কেননা, কোন স্কুলের ছেলে যদি রুটিন্-মাফিক্ ফুটবল বা ক্রিকেট্ খেলাকে বাঁধন ব'লে মনে করে, তাহ'লে তার কাছে খেলা হ'য়ে উঠে কাজ। সুতরাং ক্রীড়া-কৌতুক, খেলা-ধূলা সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে কি মনোভাব নিয়ে কোন শিশু, বালক, বালিকা, পূর্ণবয়স্ক লোক, এমন কি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা খেলা-ধূলায় লিপ্ত হচ্ছে। শিশুর খেলা আর বুড়োর খেলা যদিও এক নয়, তবুও বুঝতে হবে খেলা তখনই হয় খাঁটি, যখন লাভ হয় নিরাবিল আনন্দ। খেলা-ধূলার প্রবৃত্তি মানুষের সহ-জাত। শিশু-জীবনে, এবং পরেও, খেলা-ধূলায় একেবারে প্রমত্ত না হলেও রস-বোধ না করেছে, এমন মানুষ বোধ হয় একটিও মিল্‌বে না। শিক্ষকের পক্ষে খেলা-ধূলার ইতিবৃত্ত, সুসঙ্গত ব্যবহার এবং প্রণালী হিসাবে প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ক্রীড়া-কৌতুক সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। রেল-এঞ্জিন্ যেমন মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বাষ্প বের করে দেয়, কিংবা তা দিয়ে এঞ্জিনের চালনা ছাড়াও অন্য রকমের কাজ হয়, মানুষের বেলাতেও তেমনি শক্তির সঞ্চিত ভাণ্ডার খেলা-ধূলার মধ্য দিয়ে ব্যয়িত হয়ে—মানুষের শরীর, মন ও নৈতিক-চরিত্র-গঠনে

সহায়তা করে। এই অতিরিক্ত (surplus) শক্তি প্রধানতঃ মানস শক্তি ; মনের স্ফূর্তি ও বিকাশ এই শক্তির দান।

খেলা-ধূলা সম্বন্ধে আর একটি মত আছে। এই মতের প্রবর্তক কার্ল্ গ্রুস্। তিনি বলেন, উন্নত শ্রেণীর জীব প্রথম জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনের ভূমিকা গড়ে ; অন্যভাবে বললে বলা যায়, ভবিষ্যৎ জীবন-নাটকের 'রিহার্স্যাল' দেয়। বিড়াল-ছানা যে-কোন চলন্ত বস্তুর পেছনে দৌড়ায়, কেননা বড় হ'লে সে ইঁদুরের শত্রু হবে। কুকুর-ছানা লড়াই করে, কেননা বড় হ'লে তাকে হিংস্র হ'তে হবে। বুদ্ধিমত্তার সিঁড়ি বেয়ে যে-জীব যতটা উঠেছে, তার রিহার্সালের কাল ততখানি বেশী। মানুষের বেলাতেও এই মত ফেলে দেওয়া যায় না। বালক সেনাপতি সাজে, বড় হ'লে অন্ততঃপক্ষে সৈনিক হবে। বালিকা পুতুল নিয়ে খেলে ; মাতৃত্ব-বিকাশ হ'লে সে জীবন্ত পুতুল নিয়ে জীবনের খেলা খেল্বে। তবে কথা এই, মানুষের জীবন তো আর এতটুকু নয় যে তার গোটা ছবিটা বাল্যজীবনে প্রতিফলিত হবে। কার্ল্ গ্রুসের মতবাদ থেকে আমরা মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত কর্তে পারি, ক্রীড়া-কৌতুক মানুষের শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির একটি অভিনব কৌশল ; এতে মানুষকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অনুকূল ক'রে তার জীবনের প্রস্তুতি সম্পাদন করে।

আর একটি মতবাদ আছে, যা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্বে অংশতঃ এ বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। এর নাম দেওয়া গেছে "পুনরাবর্তন-বাদ"। আসল কথা বাদ না দিয়ে, এ সম্বন্ধে এইমাত্র বল্লে চল্বে যে মানুষ তার ব্যক্তি ও সমাজ-গত জীবনে,

বহু-জীবনের সঞ্চিত ভাব-ধারার পুনরভিনয় করে। শিশুর খেলার মধ্য দিয়ে—বয়সের স্তরে স্তরে—আদিম মানব থেকে আধুনিক মানবের অভিব্যক্তি হয়। ষ্ট্যান্‌লি হল্ এই মতের একজন জবরদস্ত সমর্থক।

সুতরাং, খেলা-ধূলা যখন মানুষের প্রকৃতিগত, তখন খেলা-ধূলার মাধ্যমে মানব-শিশুর শিক্ষাদান আবশ্যক। শিক্ষাদানের প্রণালী হিসাবে খেলাধূলার মূল্য, অথবা, অন্য কথায়, খেলাচ্ছলে শিক্ষা-দান ইউরোপ-খণ্ডে প্রথম কীর্তন করেন **কল্‌ড্‌-ওয়েল কুক্**। কুক সাহেবের বড় টিকাকার হলেন **স্যার জন্ আডাম্‌স্**। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আধুনিক সংস্করণ এই সময় থেকে সুরু হয়, বলা চলে। আডাম্‌স্ সাহেব, মণ্টেসরি, ডল্‌টন্ প্রভৃতি শিক্ষাগুরুর প্রবর্তিত নির্ঘণ্ট তৈরী ক'রে অর্থের নিষ্কর্ষ পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত ক'রেছেন। সাধু বাংলায় এর নাম দেওয়া যাক্ **ক্রীড়া-গতি**।

ক্রীড়াচ্ছলে, অর্থাৎ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে, শিক্ষাদানের পরিকল্পনায় শিক্ষার্থিগণকে গণ-শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। এই গণতন্ত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র, সঙ্গত অধিকার থাকে। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে, পাঠ্য-সূচী-বহির্ভূত বিষয়ে, শিক্ষক ও অপর জনের প্রতি আচরণ-অভ্যাসে, চরিত্র-গঠনে—শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার পরিধি ক্রম-বিস্তারের দিকে যাচ্ছে। কোন কোন শিক্ষালয়ে 'গুরু,' 'শিক্ষক' প্রভৃতি শব্দ বর্জিত হচ্ছে। ও-তে নাটক শিক্ষকের অধিকারের অতি-মাত্রা প্রকট হয়। যে-ক্ষেত্রে স্কুলের ছেলে বা মেয়েকে—স্বচ্ছন্দ-গতিতে রুচি-অনুসারে জীবনাবৃত্তি অর্থাৎ জীবনের রসাস্বাদন ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন কর্‌তে দেওয়া হয়; রস-ব্যতিরিক্ত

একটা শুষ্ক কাঠামোর মধ্যে গুজে রাখা না হয়, সেইখানেই শিক্ষা-প্রণালীর নব অভ্যুদয়। কিণ্ডারগার্টেন প্রথার পর মণ্টেসরী প্রথা; তার পর মর্ন্ডাইক, ওয়াট্সন্ প্রভৃতির বিজ্ঞানমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি—শিশু-কেন্দ্রিকতার ক্রমবিকাশ। এই ক্রমবিকাশের মূল সূত্র ক্রীড়া-গতি।

ভূগোল পড়াতে গিয়ে নদী-পর্বত-উপত্যকার সন্ধান, ইতিহাস পড়াতে গিয়ে প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন, আলোক-চিত্র গ্রহণ, নক্সা-তালিকা নির্মাণ—শিক্ষার্থীকে ক্রীড়া-গতি-পথে চালিত করে। অঙ্ক কষ্তে গিয়ে আবিষ্কারের আনন্দ-উপভোগ যদি শিক্ষার্থীকে কর্তে দেওয়া হয়, তা'হলে নীরসতা নীরব সাধনায় রূপান্তরিত হবে। এম্নি ক'রে সব বিষয়েই শিখ্তে হবে, মাথায় গুঁজ্তে হবে—এ ধারণা নিয়ে যদি শিক্ষার্থী না চ'লে—আস্বাদ, উপভোগ এবং আনন্দের রূপায়নে সে ব্রতী হ'তে পারে, তা'হলে তার পক্ষে শিক্ষা হবে ক্রীড়ার নামান্তর, প্রাণ-ধর্মে পুষ্ট। তার জড়তা, আড়ষ্টতা ক্রমশঃ ঘুচে গিয়ে আসবে ভাবের উন্নয়ন এবং মনের উপরে অসীম প্রভাব। সে শুধু বিষয়-বিশেষের বা বিষয়-সমষ্টির আধার হ'য়ে থাক্বে না; সে হবে স্রষ্টা, অনেক ক্ষেত্রে নব-স্রষ্টা—সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং গণিতের।

পাঠ্য-বহির্ভূত বিশাল রাজ্যে তার স্বারাজ্য হবে আরও দৃঢ়। শিক্ষার্থীর দল পরিচালন কর্বে স্কুলের অন্তর্বর্তী শাসন ও কর্মসূচী, ছাত্রাবাস, পাঠাগার, অবসর বিনোদনের বিবিধ উপায় ও উপাদান, স্কাউট্ ও ব্রতচারীর শৃঙ্খলা-মূলক আনন্দ-পরিবেশন, তীর্থ-পরিক্রমা, সাংবাদিকতা, জন-সেবা, এবং নানা প্রকারের কর্মকেন্দ্রিক ব্যবস্থা।

কর্মের একটা আস্বাদ, একটা আকর্ষণ আছে। কর্মের আনন্দের মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলি অধিগত হয়, তারা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীর মনের ভিত্তিতে। কলা-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের শক্তি পরিপুষ্ট লাভ করে। নবতন্ত্রের শিক্ষাবিদ্গণ এই দিক্ দিয়ে নয়া তালিম দিচ্ছেন। এঁরা শিক্ষার বনিয়াদ গড়্ছেন। পূর্বপথচারিগণকে এঁরা ভোলেন নি। এঁদের প্রধান অবলম্বন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি শিক্ষার্থীর শারীর-মানস সম্পদ্। এই সম্পদ্ সৃষ্টি কর্তে গিয়ে শিক্ষাব্রতীকে হ'তে হয় বিজ্ঞানী। তাতে চাই শিক্ষার্থীর মানস-সম্পদের পরিমাপ। শিক্ষক কোন্ শ্রেণীর, অর্থাৎ কোন্ বিশিষ্ট সম্পদের অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীর উন্নয়ন-কার্যে নিবিষ্ট হবেন, তা নির্ভর কর্বে—সেই ছাত্র বা ছাত্রীর মানস সম্পদের মানের উপর। সেইজন্য শিক্ষা-পরিমাপ আধুনিক যুগের একটি অভিনব উপায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে হবে।

আমাদের বর্তমান বক্তব্য বিষয়ের উপসংহারে বল্তেই হচ্ছে—দুটি প্রণালীর মধ্যে কোনটিই কম নয়। "রুটিন্" (অর্থাৎ "পুনরাবৃত্তি"-র) প্রয়োজনীয়তা যে পরিমাণে আছে, স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশে ক্রীড়ানুগতার আবশ্যকতাও সেই পরিমাণেই আছে। শেষোক্ত ব্যাপারে পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত স্বাধীনরাজ্যের ইতিহাস পাচ্ছি। এই রাজ্য গণ-তন্ত্রী। রাজা আছেন একজন, নামে মাত্র। মাষ্টার মহাশয় শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক রাজা—Constitutional monarch। এঁর স্বাক্ষর দরকার, কিন্তু সাক্ষাৎ যোগাযোগ দরকার নেই। পরিচালন-ভার ছেলেমেয়েদের নিজেদের।

মনের বিকাশ

শিশুর আমিত্ব-বোধ কখন থেকে হয়, কি ভাবে হয়, জান্‌তে পারলে শিক্ষক তাই নিয়ে তাঁর কস্‌রৎ আরম্ভ কর্‌তে পারবেন। প্রশ্নটি বড়ই জটিল। "অহংবোধ" জিনিসটি কি, এর উদ্ভব কোথায়, সে তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এইটুকু বুঝি, শিশু তার চৈতন্যের বিকাশের অল্প পরেই বুঝতে পারে—"আমি," "আমার", "আমাকে"। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাই তার অহং-জ্ঞানের উপাদান। শরীরের কোন স্থানে ব্যথা বোধ কর্‌লে সে বলে—"আমার ব্যথা লাগ্‌ছে।" সে হয়ত তখনও বোঝে না, আমি কি, ব্যথা কি। পৃথক্‌-করণ হয়ত তখনও তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দন্তোৎগম-কাল পর্যন্ত—তার নড়া-চড়া, গতি-বিধি অনেকটা যন্ত্রবৎ থাকে। সে কাঁদে, অর্থহীন হাসি হাসে, হাত-পা ছোঁড়ে, মাথা নাড়ে, কা'ত হ'য়ে শোয়, উবু হয়, চাকার মত ঘোরে, আলো দেখ্‌লে চোখ বড় ক'রে তাকায়, লাল্‌ রং-এর কোন জিনিস দেখ্‌লে হাত বাড়ায়, লোভনীয় জিনিস দেখ্‌লে তার মুখ দিয়ে লালা পড়ে। এই যে বিভিন্ন ক্রিয়া, তার ভিতরে অনুভূতি আছে, কর্তৃত্ব-বোধ নাই। বহির্জগৎ তখনও শিশুর কাছে এলোমেলো। যতই সে একটু ক'রে বড় হ'তে থাকে, ততই এই এলো-মেলো জগৎটাকে সে খানিকটা নিজের ক'রে নেয়, তার সম্ভাব্য শৃঙ্খলা তার ক্ষুদ্র মনোরাজ্যে

স্থাপিত হয়। সে তখন বোঝে, বহির্জগৎ এক, সে আর। এই সম্পর্ক-স্থাপনে তার অহং-বোধের সূত্রপাত। ততদিনে বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হয়; বাক্-শক্তি তার আমিত্ব জাগাবার প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। লোকে তাকে নাম ধ'রে ডাকে; সে ধীরে ধীরে সন্ধান পায় নিজের। কেউ যদি বলে, "বাছা, এই কাজটি কর, ঐ কাজটি কর," সে তখন সম্‌ঝে নেয় যে সে একজন কর্তা, সে কাজ কর্‌তে শিখেছে, অনুভব কর্‌তে পারে। নিজের দেহটা ঠিক যেন তার নিজের নয়। যেন সেটা আর দশটা বাইরের বস্তুর মত। অথচ সে বুঝতে পারে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উপর তার আধিপত্য আছে। সে নিজেই সেগুলির চালনা করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনায় সে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ অনুভব করে। সুতরাং তার দেহ যে তার নিজের, দুনিয়ার আর সব কিছু অন্য, এই জ্ঞান তার সৃষ্টি হয়। দেহ-বোধে 'আমি'-বোধের প্রারম্ভ।

সে তখন মনে করে,—তার হাত-পায়ের মত, বাইরের অন্য সব কিছু তার কথা শুনে মেনে চলে। খেলার পুতুলকে শুতে বলে; কুকুরের বাচ্চাকে দৌড়াতে বলে; মানুষের ছবিকে খেতে বলে; চেয়ারখানাকে ঘুর্‌তে বলে;—অর্থাৎ সে ভাবে, তার হাত-পা-মাথা যেমন তার নিজের, তার অনুগত, দুনিয়ার সব জড়, চেতন পদার্থ তার অনুগত। আবার, এটাও বোঝে যে এরা কেউ তার কথা শোনে না, মানে না। শিশু মনে ভাবে, বাইরের সব পদার্থ ঠিক তারই মত ভাবে ও চলে। সে যেন আপনাকে ঐ সবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেয়। মানুষের এ অভ্যাস আদিম কালের। জড়পদার্থে ব্যক্তিত্বের আরোপ প্রাচীন যুগে কে না করেছে? ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীসীয়,

রোমক—সকল জাতির আদি-মানবেরা নদী, পর্বত, আকাশ, বায়ু, ব্যোমকে বিরাট্ ব্যক্তি—শক্তিধর দেবদেবী অথবা দৈত্য বলে কল্পনা করেছে। কল্পনা নয়—দৃঢ় বিশ্বাস। শিশু-মানবও তাই করে।

শিশুর আমিত্ব-বোধের পরিধি এ অবস্থাতে বড় সংকীর্ণ। তখন তার কাছে তার ক্ষুদ্র আমি—আর বিরাট্ বহিঃ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তার আমিত্বের সম্প্রসারণ হয় সামাজিক আবেষ্টনে। সামাজিক আবেষ্টনের প্রারম্ভ গৃহে, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ও পরিজনদের মধ্যে। শিশু ক্রমশঃ বোঝে—মানুষ আর মনুষ্যেতর পদার্থের পার্থক্য। মানুষ নড়ে-চড়ে, নানারকম শব্দ করে, শিশুর নানাপ্রকারে পরিচর্যা করে, খাওয়ায়, শোওয়ায়, পোষাক পরায়, কোলে-পিঠে নেয়, আদর-যত্ন করে, অসুখে সুখ দেয়। মনুষ্যেতর জীব বা জড়-পদার্থ—এ সবের কিছুই করে না। সুতরাং শিশুর মনে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। এর পরই শিশু শিখে এদের অনুকরণ কর্‌তে। এক একটি ব্যাপারের অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে সে এক এক রকমের ভাবাবেগ অনুভব করে। সুখ-দুঃখ-বোধ, ভয়, সাহস, ভালবাসা, সমবেদনা, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা সব কিছুই ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে শিশুর মনে স্থান-লাভের জন্য ঘোরা-ফেরা করে। তার নিজের মনের রং-বেরং-এর বিম্ব অন্যের মনে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ, সে নিজে যতটুকু ভাব্‌তে শিখে, মনে করে অন্যেও ঠিক ততটুকু ভাবে। খেলা কর্‌তে গিয়ে সে অপরের ভাবের অভিনয় করে। ছোট একটি মেয়ে মা সেজে পুতুলের যত্ন করে ; এর ফল হয় এই, তার মা তার জন্যে কতটুকু করেন বা ভাবেন, তা সে ভাব্‌তে ও বুঝ্‌তে শিখে। সুতরাং দুই প্রকার চাপে তার কোমল

মনটি প্রশস্ত হয়। প্রথমে অন্যের অনুকরণ, পরে অন্যের মধ্যে নিজস্ব ভাবের অনুপ্রবেশ। সে ধীরে ধীরে অনুভব কর্‌তে শিখে—সে-ও অন্য দশজনের মত একজন। এক কথায়, সে তার আমিত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করে। এ ব্যাপারটি সামাজিক পরিবেশের পরিণতি। বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে, ঘরে কিংবা বাইরে নানা ব্যক্তি ও ঘটনার স্পর্শে সে বেশ বুঝতে পারে নিন্দা কি, প্রশংসা কি, শাস্তি কি, সান্ত্বনা কি। তার জন্ম-গত প্রবৃত্তির সঙ্গে নূতন-পাওয়া অস্পষ্ট ভাবগুলি সম্মিলিত হ'য়ে তার প্রকৃতি গঠিত হয়। তার আত্মবোধের চারপাশে—তার অহং-ভাবকে কেন্দ্র ক'রে—অন্যের নিকট থেকে পাওয়া ভাবগুলি ঘু'রে ঘু'রে শিশুর ভাবাবেগ (emotion), স্থায়ী প্রকৃতি (sentiment ও temperament) এবং চরিত্র (character) তৈরী করে। শিক্ষক জানেন, এই তৈরী করার কাজে তাঁর কর্তব্য কতখানি। তিনি জানেন, শিশু কেমন অকপটে অন্যের ভাব-গ্রহণে উন্মুখ। স্থতরাং তাঁর দায়িত্ব কত গুরুতর! শিশুকে যদি অনবরত শুনান হয়, "তুমি দুষ্ট, তুমি গোল্লায় গেছ", তা'হলে সে মেনে নিবে সেই কথা; তার স্বভাবও হ'য়ে পড়্‌বে সেই ভাবের। এ রকমের কথা অবিচ্ছেদে শুন্‌লে বুড়োরাও সন্দিগ্ধ হ'য়ে নিজকে ডুবিয়ে দেয়, মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারে না।

শিশুর যে স্থায়ী প্রকৃতি তৈরী হয়, তার মধ্যে প্রধান দু'টি ভাব (sentiment), একটি ভালবাসা, অপরটি বিদ্বেষ। দেখা যায়, ধীরে ধীরে প্রথমটিই প্রধান হয়। ভালবাসবার ক্ষমতা যত বাড়ে, বিদ্বেষ ততই সংকুচিত হয়। বিদ্বেষ মরণ-ধর্মী, সে

সব জিনিসকে নষ্ট করতে চায় ব'লে নিজে নষ্ট হয়। ভালবাসা প্রাণ-ধর্মী, সে সব বস্তুকে আপনার ক'রে নিতে চায়, তাই তার প্রসার ঘটে। বিকাশোন্মুক শিশু-মনে সেই জন্য ভালবাসার ছাপ পড়ে বেশী। সে যতই ভালবাসা পায়, ততই চায়। আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্কের মত নিঃসঙ্গ থাক্‌লে—তার কোন বৃত্তিই প্রস্ফুটিত হ'ত না। নীতিবোধ আসে সৎ-সঙ্গের ও স্নেহের সুকোমল সংস্পর্শে। তাই, ম্যাক্‌ডুগ্যাল লিখেছেন, "In the main, it is by sympathetic contagion and by suggestion from admired personalities that the child's moral sentiments are shaped." সুকুমার বৃত্তিগুলির উদ্ভব হয় তিনটি পর্যায়ে। প্রথমে বিশেষ কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন স্নিগ্ধ আচরণ শিশুর মনকে নাড়া দেয়। পরে সে ঐ রকম আচরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে আপনার ক'রে নিতে শিখে। এই গেল দ্বিতীয় পর্যায়। তারপরে আসে তার বিচার-বোধ,—একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রীতির সুস্পষ্ট ধারণা। এই সম্পর্কে রস্ সাহেবের নিম্নলিখিত উক্তিটি বড় সুখপাঠ্য। তিনি লিখেছেন,—"He may love a man who is courageous, then he loves all courageous men, finally he loves courage itself."—শিশু প্রথমে একটি সাহসী লোককে ভালবাসে ; পরে সব সাহসী লোককে তার ভাল লাগে ; শেষে সাহস জিনিসটাতেই তার আকর্ষণ জন্মে। দৈহিক শক্তির পূজারী হয় সে প্রথমে ; পরে নৈতিক বল তাকে মুগ্ধ করে। বালক বা বালিকা নৈতিক বলের দৃষ্টান্ত খোঁজে তার পরিবেষ্টনে, অর্থাৎ পরিজন ও প্রিয়জনের মাঝে।

তারপর যখন সে কিছু বড় হয়, তখন তার কিশোর চিত্ত ঢুঁড়ে বেড়ায় দেশ-বিদেশের ইতিবৃত্ত, বীরত্বের গাথা। রণক্ষেত্রের শস্ত্রবীর ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয় ধর্মবীর কর্মবীরের কাছে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে—তার কাছে বীর-পরিচিতি। শিশুর মনঃ-ক্ষেত্রকে তিনি কর্ষিত কর্‌বেন—নীতি-কথার সার দিয়ে। তিনি হয়ত নিজেই বিস্মিত হবেন—তাঁর শিশু-ফুলের বাগানে তাজা রঙ্গীন ফসল দেখে।

নীতি ও সত্যের মধ্যে যখন ছেলের আস্থা জন্মিবে, তখন উন্নত আদর্শ তার জন্যে তৈরী হবে। এই আদর্শের দিকে ধাবমান হ'তে হ'তেই সে নিজকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত কর্‌তে পারবে। এক্ষেত্রে প্রসারণ এবং উন্নয়ন (Sublimation) একই কথা। মানস বৃত্তি-মাত্রেরই উন্নয়ন সম্ভব এবং সাধনীয়। তাতেই বিকশিত হয় মানব-চরিত্র।

চরিত্র গ্রন্থিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অনেকখানি নির্ভর করে প্রকৃতির উপরে। এখানে প্রকৃতি বল্‌তে ইংরেজিতে বুঝ্‌বো temperament, অর্থাৎ স্থায়ী মেজাজ। অসতর্ক দৃষ্টিতেও দেখ্‌তে পাই, কোন কোন লোকের মেজাজ গরম, কারও বা স্নিগ্ধ। কেউ বা সর্বদাই বিষণ্ণ, কেউ বা প্রফুল্ল ও আশাবাদী। অনেকের পক্ষে তিক্ততা এনে দেয় একটা অর্থহীন রিক্ততা। শারীর-তত্ত্বে এই বিভিন্নতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার প্রভাব বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। মানব-দেহের, সুতরাং মানব-মনের উপর বাত, পিত্ত, কফ প্রাধান্য অনুসারে সক্রিয় হয়। এ তত্ত্ব বিজ্ঞান-সম্মত, প্রাচীন ভারতের দেহ-বিজ্ঞানীদের ভূয়োদর্শন-সম্ভূত। বাত-প্রধান,

পিত্ত-প্রধান এবং শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির আকৃতি এবং প্রকৃতির যে চুল-চেরা বিচার আয়ুর্বেদে আছে, তা বিস্ময়াবহ প্রাচুর্যে ভরা। এ কালের পাশ্চাত্য মনীষীরা thyroid gland-এর অসীম প্রভাবের প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে বলেছেন, শরীরের অভ্যন্তরস্থ gland বা 'নাড়ী' মানব-মনের গঠনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়। এই নাড়ীগুলি আবার বংশ-পরম্পরায় পুষ্টি অথবা শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন অধ্যায়ে এই পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ব আলোচিত হবে।

মানুষের চরিত্র প্রকাশিত হয় তার কর্মে। কর্মের উৎস মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে। এই ইচ্ছাশক্তির প্রারম্ভ ও বিকাশ শিশু-মনে কি ভাবে হয়, তা বিশেষ অনুধ্যান এবং অনুশীলনের বিষয়। মনস্বী ড্রেভার বলেছেন, আত্মবোধের পূর্ণ, পরিণত এবং চলমান স্বরূপকে "ইচ্ছা-শক্তি" এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। দেহাধারস্থিত জন্মার্জিত বৃত্তিগুলি পরিণতি লাভ ক'রে Sentiment অর্থাৎ কর্মচৈতন্যে; আবার কর্ম-চেতনার সুসংস্কৃত রূপ উদীয়মান হয় ব্যক্তিত্বে। মানুষের ব্যক্তিত্বই অবস্থা-বৈষম্যের মধ্যে অদ্ভুত সমীকরণ সম্পাদন করে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত ক'রে, নানা কর্মের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র-গঠনের সহায়তা করাই শিক্ষকের সব-চেয়ে বড় কাজ।

শিশুমনের বিকাশ-ব্যাপারে দেহ-তত্ত্বের আলোচনা অপরিহার্য। পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন, endocrinology (বা কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব) একটি অভিনব বিষয়; ductless glands, অর্থাৎ নালী-বিহীন নাড়ী মানবদেহে; এবং তার ফলে মানব-মনের উপর যে ক্রিয়া করে, তাতে স্বাভাবিক মানুষের প্রকৃতি অনেকটা নির্ধারিত হয়। যদি

এই নাড়ীর ক্রিয়ার মধ্যে কোন প্রকার বিকার জন্মে, তা'হলে শিশু-প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটে ; সেই শিশু, বড় হ'লে অপরাধীর তালিকায় প'ড়ে যায়। এই নবতর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন রুশিয়ার **প্যাভ্‌লভ্‌** (Pavlov) এবং মার্কিণ-দেশের **ওয়াটসন** (Watson) সাহেব। এঁদের মতবাদের নাম "Behaviourism" বা **ব্যবহার-তত্ত্ব**। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বহু সমীক্ষা ও পরীক্ষার ফলে এঁরা গর্ভজাত সন্তান থেকে আরম্ভ ক'রে কিশোর ও তরুণদের দৈহিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিঃসংশয়িত সমাধান কর্‌তে পেরেছেন ব'লে মনে করেন। Central nervous system বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মানুষকে জীব-সাধারণ থেকে অনেক উর্ধ্বে তু'লে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে-সব রকমের শক্তি সুপ্ত হ'য়ে আছে, তাদেরকে জাগ্রত করাতে হবে, অভিভাবকে ও শিক্ষককে—এ কথা নতুন নয়। ভারতীয় শিক্ষা-তত্ত্বের গোড়ার কথা এই প্রসঙ্গে এ'সে পড়ে। মানুষ যে অপরিসীম শক্তির আধার ভারতীয় শাস্ত্র তা তারস্বরে ঘোষণা ক'রেছে। বেদে যা ছিল অস্পষ্ট, তন্ত্রে তা হয়েছে সুস্পষ্ট। বেদে হয়েছিল সমীক্ষা, তন্ত্রে হয়েছে পরীক্ষা। তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ার মূলাধার আয়ুর্বেদোক্ত শারীর-স্থান। আবার, আয়ুর্বেদের অবলম্বন সাংখ্যদর্শন। দেহের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চভূত—বহির্জগতের পঞ্চভূতের সংহতি। দেহস্থিত ক্ষিতি বহিঃস্থ ক্ষিতির উপাদানের অপূর্ব সমাবেশ, অর্থাৎ দেহের অস্থি-মাংস-চর্ম-চর্বি-মাটি দিয়ে তৈরী ; এগুলি মাটিতে মেশায়। দেহস্থিত দ্রব পদার্থ, যথা রস-রক্ত বহিঃস্থ অপ্‌ বা জলের নূতন রূপ। দেহের উত্তাপ বাহিরের অগ্নি ; শ্বাস-যন্ত্র বায়ু, এবং অণুও কোষগুলির বিচরণ-ভূমি অনন্ত ব্যোমের ক্ষুদ্রতম

প্রতিকৃতি। ভিতর-বাহিরের যোগাযোগের দ্বার মানুষের ইন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। এরা কর্মেন্দ্রিয়; দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ—এই পাঁচ রকমের ক্রিয়ার ধারক ও নিঃসারক—পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়। দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ যোগ হ'তে দর্শন-ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা ও অনুভূতি। শ্রোতব্য শব্দের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ যোগ হ'তে শ্রবণ ক্রিয়ার উদ্ভব ও অনুভূতি। আঘ্রেয় পদার্থের সহিত নাসিকার, অর্থাৎ আঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ সম্পর্ক থেকে আঘ্রাণ-ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা ও অনুভূতি। খাদ্য ও পেয় পদার্থের সহিত জিহ্বার সংযোগ ও ব্যবহারে স্বাদানুভূতি, এবং যে-কোন জড় বা চেতন পদার্থের সহিত ত্বকের সম্পর্ক ঘট্‌লে স্পর্শানুভূতি মানুষ-মাত্রেরই হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের পেছনে আছে—চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বক্। এদের আগে আগে আছে—বহির্ভূত, অর্থাৎ আকাশাদি। তাদের পেছনে আছে পঞ্চ-তন্মাত্র। মন এদের পশ্চাতে উঁকি মার্‌ছে। মনের অন্তরালে বুদ্ধি। বুদ্ধির সক্রিয় পরিচালক অহংকার, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণার মূলাধার ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও তার শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা-শক্তি। বেদ পূর্বেরটির এবং তন্ত্র পরেরটির তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এক বড় 'অহং' থেকে ছোট ছোট 'অহং' সঞ্জাত হয়েছে এবং অনন্তকাল ধ'রে হচ্ছে। মানবেতর জীবের অহং-বোধ সুস্পষ্ট নয়। মানবেতর জীবের ভাব ও কর্ম instinct বা স্বভাবজ ধর্মের অধীন। মার্কিন মনীষী Watson 'instinct' মান্‌তে চান না। তিনি বলেন, জগতের মূলীভূত শক্তি একটি অখণ্ড প্রবাহ—Activity stream ; instinct তারই

খণ্ডিত বিলাস বা তরঙ্গ। কেননা instinct অনেকাংশে দৃঢ়ীভূত এবং সমীকৃত reflex, অর্থাৎ স্বভাবজ প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। এই reflex যখন বাধা-বন্ধহীন, তখন নিম্নস্তরের; কিন্তু তা যখন বাধা-বন্ধের প্রভাবে রূপান্তর গ্রহণ করে তখন উচ্চস্তরের জীবের স্বভাবগত হয়। এই ভাবে অমেরুদণ্ডী জীব থেকে মেরুদণ্ডী জীবের বিবর্তন ঘটে। মানব-শিশু মেরুদণ্ডী জীবের চরমোৎকর্ষ। রুশিয়ায় এবং মার্কিন মুলুকে মানব-শিশুর চরম পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। *

মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথা— S—R, অর্থাৎ stimulus এবং response; এর অর্থ, উত্তেজনার অনুপাতে প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার নিম্নতম অবস্থাকে ইংরেজিতে reflex বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়া নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই প্রকাশ করে, কেননা ও-জিনিসটি তার জন্ম-লব্ধ সম্পৎ। ও-বস্তুটির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। ওর বৈশিষ্ট্য চারটি,—অজটিলত্ব, পৌনঃপুন্য, দ্রুতত্ব এবং জন্মকালেই পরিপূর্ণতা। নবজাতকের নব-গঠিত দেহের অভ্যন্তরস্থ গঠন-প্রক্রিয়ার ও একটি ফল। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা জীব ও মানবের প্রতিক্রিয়া-মূলক আচরণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন,— অপরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনশীল। মানবেতর জীবের আচরণ মোটের উপর অপরিবর্তনীয়; মানবের আচরণ শিশুকাল থেকেই

* "Through the development of a science of human behaviour, education has made great progress in recent years. Though the ideal procedures in education are, of course, still unknown, *the new understanding of mental development* has innumerable educational applications in the home and the school."

Skinner and Harriman—'Child Psychology' P. 191.

পরিবর্তন-যোগ্য। এই পরিবর্তনের ক্রমোন্নতিকে Peter Sandiford একটি নক্সায় নাম দিয়েছেন—Tropism, emotion, reflex, instinct এবং সর্বশেষে intelligence। Tropism এক রকমের অন্ধ বৃত্তি। পতঙ্গের বহ্নিমুখে প্রবৃত্তিকে tropism বলা চলে। কৃমি-কীটের আশ্রয়-পরায়ণতা এক প্রকারের tropism। কীটের এই বিবর-প্রবেশের অভ্যাস আত্মগোপনের পরিচায়ক ততটা নয়, যতটা কোন কঠিন বস্তুর উপর দেহ-সন্নিপাতের প্রয়োজনীয়তা। মানব-শিশুর বেলায় tropism দেখা যায় না, কিন্তু reflex দেখা যায়। Warren সাহেব reflex সম্বন্ধে একটি ফর্দ্দ তৈরী করেছেন।

"ক"-শ্রেণীর reflex, বা দৈহিক প্রতিক্রিয়া। এগুলি মানুষের যৌবনাগমেও বদলায় না।

১। চোখের মণির ঘোরা-ফেরা।

২। কাণ পেতে থাকার অভ্যাস।

৩। উত্তাপ ও ব্যথায় হাত টানা।

৪। আহারে পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রিয়া।

৫। নাক-ডাকা।

৬। শিহরণ।

৭। কোন শব্দ শু'নে চম্‌কে ওঠা।

৮। ভয়ে কাঁপা।

৯। শীতে কাঁপা।

১০। অর্ধাঙ্গ বা ভির্‌মি রোগে যেমন হয়—থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপা।

"খ'-শ্রেণীর reflex। এগুলি কমা'লে কমে, বাড়া'লে বাড়ে।

১। আলো দেখে চোখ্ মিট্ মিট্ করা।

২। চোখের পাতা বন্ধ করা।

৩। অপলক দৃষ্টি।

৪। হিক্কা।

৫। হাঁচি দেওয়া।

৬। হাঁটু ভাজানো।

৭। মাথা-ঘোরা।

৮। হাই তোলা।

৯। বমি করা।

১০। মুখের বিকৃতি, প্রধানতঃ বিস্বাদ বস্তুর আস্বাদনে।

১১। জিহ্বায় জল পড়া।

১২। কাতু-কুতু দিলে চঞ্চল হওয়া।

১৩। হাত কোঁক্ড়ানো, চাম্ড়ায় আঘাত পেলে।

১৪। পায়ের তলায় কোন কিছু লাগ্‌লে পা কোঁকড়ানো।

১৫। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল টেপা, অর্থাৎ ঐ দিয়ে দেহ সাম্‌লানো।

১৬। আরক্তিম হওয়া বা ফ্যাকাসে হওয়া।

১৭। ঘুমে ঝিমানো।

১৮। ঘর্মাক্ত হওয়া।

১৯। গ্যাঙ্‌ড়ানো, বা আর্তনাদ করা।

২০। হাসা।

২১। হাত-পা খিঁচানো।

২২। কৃমি-কীটের মত কুঁক্ড়ে যাওয়া।

"গ"-শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া বা reflex—এগুলি সংশোধন-যোগ্য।

১। কাসি দেওয়া।

২। কোন জিনিস গলাধঃকরণ করা।

৩। যৌন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার।

৪। সুগন্ধ বা দুর্গন্ধে প্রীতি বা অপ্রীতি-বোধ।

৫। খাবি-খাওয়া।

৬। ফুঁপিয়ে কাঁদা।

৭। মৃদু হাস্য করা।

৮। ব্যথায় চম্‌কে ওঠা।

৯। ভ্রূকুটি করা।

১০। হাত-পা ছড়িয়ে দেওয়া।

১১। তীব্র ব্যথায় আকুলি-বিকুলি করা—ছট্‌-ফট্‌ করা।

"ঘ"-শ্রেণীর reflex ; এগুলি যৌবনে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়।

১। চুষে' খাওয়া, প্রথমে মাতৃ-স্তন্য।

২। কামড়ানো ও চিবানো।

৩। থুথু ফেলা।

৪। ক্ষুৎ-পিপাসাতুর হওয়া।

৫। ওষ্ঠ ও জিহ্বার ব্যবহার।

৬। কণ্ঠের ব্যবহার।

৭। মাথা নাড়া।

৮। কোন কিছু ধরা।

৯। হাতের কব্‌জি নাড়ানো।

১০। জড়িয়ে ধরা।

১১। হাত বাড়িয়ে ধরা।

১২। লাথি দেওয়া।

১৩। লাফ দেওয়া।

১৪। উঠে' বসা।

১৫। সাম্‌নে ঝুঁকে পড়া।

১৬। দাঁড়ানো।

আর একজন মার্কিন মনীষী তাঁর শিশু-মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক একখানা বইতে* লিখেছেন, একটি নবজাত শিশু জন্মের পর চতুর্থ দিনেই বাইরের শব্দের সম্বন্ধে সচেতনতা দেখিয়েছে; চতুর্থ মাসে তার শয়ন-গৃহের যে-কোন দিক্ থেকে যে-কোন শব্দ এলেই সে ঠিক সেইদিকে মাথা ফেরাতে শিখেছে। জর্জ নামে একটি শিশু নিদ্রা, আহার এবং স্নান সম্বন্ধে রুটিন্ মেনে চল্‌বার একটা অভ্যাস যেন পেয়ে বসেছে। তার যখন দু' মাস, আড়াই মাস বয়স, তখনই সে যেন খাবারের সাড়া পেত, বিশেষ ক'রে যখন তার মা তার গালের নীচে তোয়ালে পেতে দিত—কমলা লেবুর রস খাওয়াতে। সুতরাং কোন শিশু যে গ্রহণী শক্তি বর্ধিত ক'রে নূতন নূতন সক্রিয়তা দেখায়, এর মূলে নিশ্চয়ই আছে তার মানস বিকাশ। এতে ক'রেই শিশুর মন গ'ড়ে ওঠে।

* "Child Psychology"—By Skinner & Harriman—Ch. VIII.

"If the infant were incapable of receiving and responding to stimuli, and of acquiring new modes of responses, there would be nothing of what we call *mind* or *mental development*."

Child Psychology—P. 182.

এই শিশু-পরীক্ষক আরও লিখেছেন, ফ্রাঙ্ক্ নামে একটি শিশু স্নানে খুব আনন্দ বোধ কর্‌ত, যখন্ তার মাত্র ছ'মাস বয়স ছিল; এর দিন পনর পরে—তার মাকে টবে জল ভর্তি কর্‌তে দেখ্‌লে কিংবা জলের শব্দ শুন্‌লেই আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ত। আমরাও হামেশা ঘরে ঘরে দেখেছি যে, মা শিশুর মুখের সাম্‌নে "তাই তাই" ব'লে হাততালি দিতে দিতে—শিশু হয়ত মনে করে (কেননা, তখন তার 'মন' নামক পদার্থটি জন্ম নিয়েছে) "তাই তাই" বল্‌লেই হাত-তালি দিতে হয়; শেষে সে নিজেই হাত-তালি দিতে শুরু করে। শব্দার্থের অভিগম তখনো তার হয় নি; সে তখনো শারীর ক্রিয়া-সমষ্টির অনুগামী, কিন্তু একটি সুপরিপুষ্ট মনের অগ্রগামী।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, reflex (উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া) দু'রকমের, পরিবর্তন-নিরপেক্ষ ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ (unconditioned এবং conditioned)। এ সম্বন্ধে Pavlov-এর প্রবর্তিত প্রণালীর অনেক নূতন রকমের অনুশীলন হয়েছে। ল্যাশ্‌লী সাহেব জিহ্বা থেকে রসক্ষরণের পরীক্ষা করেছেন—একটি শিশুর ওপরে। রসক্ষরণের মাত্রার চুল-চেরা হিসাব করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, একহাত দূর থেকে এক টুকরো চকোলেট্ কিছুকাল দেখিয়ে ঠোঁটের ওপর ধরেছেন—পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। শিশুর মুখের গোড়ায় ছোট্ট একটি পেয়ালা গুঁজে রেখে, তার সঙ্গে একটি নল বের ক'রে দিয়েছেন; ঐ নলের মধ্য দিয়ে মুখের রস ফোঁটা ফোঁটা বেরিয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে।

লালা-ক্ষরণের সাধারণ পরীক্ষিত মাত্রা ১ মিনিটে ১ ফোঁটা। পরে—শিশুর হাতে চকোলেট্ দিলে—

১ম মিনিটে— ৪ ফোঁটা।

২য় ,, — ৩ ,, ।

৩য় ,, — ৪ ,, ।

শিশু চকোলেট্ আঘ্রাণ করলে—৫ ফোঁটা।

চকোলেট্ ঠোঁটের কাছে ধর্‌লে ও মুখ বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে—৯ ফোঁটা।

চকোলেটের আস্বাদে লালা পড়ে বটে, কিন্তু দূরে ধ'রে রাখ্‌লে যে মাত্রা বাড়ে, ল্যাশ্‌লী তার পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করেন। এ ক্ষেত্রে উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হ'ল। স্যাণ্ডিফোর্ড্ আরও কয়েকজনের পরীক্ষার ফলাফল বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন নিম্নরূপে।

১। পরিবর্তিতব্য প্রতিক্রিয়া অনেকটা সাময়িক ও অস্থায়ী। অ-প্রয়োগে নূতন অভ্যাস (প্রতিক্রিয়া-সমষ্টি) নষ্ট হয়। সুতরাং কোন নূতন-শেখা অভ্যাসকে স্থায়িত্ব দিতে গেলে—পরিবর্তন-নিরপেক্ষ উত্তেজনার (unconditioned Reflex) নিয়মিত এবং আবর্তিত প্রয়োগ দরকার। অল্প প্রয়োগে বিচ্ছিন্ন অভ্যাস-গ্রন্থি পুনঃসংযোজিত হয়। সোজা কথায় বল্‌তে গেলে, পুনঃ-শিক্ষা প্রথম শিক্ষার চেয়ে সহজসাধ্য।

২। নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া (conditioned Response) সর্বদাই বিশিষ্ট (specific), অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রকারের অবস্থা

Ref.—Sandiford—Pp. 177-78.

বা নিয়ন্ত্রণ ঠিক সেই প্রকার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া জন্মায়। কোন শব্দ থেকে সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া—শব্দের আওতার মধ্যেই থাকে; স্পর্শ বা দৃষ্টি-বোধের সীমানার বাইরে তা যায় না। অল্প কথায় বল্‌তে গেলে,—শিক্ষণীয়ের সহসা পরিবর্তন সহজ ব্যাপার নয়।

৩। কিন্তু, যদি শব্দ ও স্পর্শাত্মক অবস্থার প্রয়োগ যুগপৎ পরিচালিত হয়, তাহ'লে নব-গঠিত অভ্যাস বা প্রতিক্রিয়া সংযোগ-মূলক হয়ে সুদৃঢ় হয়। স্যাণ্ডিফোর্ড এর নাম দিয়েছেন—Law of Summation।

৪। নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বা অভ্যাস অপ্রয়োগে মন্দীভূত এবং ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। অনিয়ন্ত্রিত উত্তেজক (stimulus) না থাক্‌লে নিয়ন্ত্রিত উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত উত্তেজক নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ কর্‌লে অভ্যাসের অবসানের নিম্নলিখিত সময় লাগে।

২ মিনিট্ পরে পরে নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ চালালে—
অভ্যাসের অবসান হয়—১৫ মিনিটে।
৪ মিনিট্ পরে পরে নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগে—অবসান—২০ মিনিটে।
৮ ,, ,, ,, ,, ,, ৫৪ ,,।
১৬ ,, ,, ,, ,, ,, ১২০ ,,।
(তাতেও পূর্ণ অবসান হয় না।)

এখানে বড় কথা এই, অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা-সমাবেশের সুযোগ মোটেই দেওয়া হয় নি। একটি পোষা কুকুরকে খেতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজানো হত; ঘণ্টা বাজালেই তার জিহ্বায় জল পড়্‌ত। কিন্তু, যদি প্রথমবার ঘণ্টা বাজানোর পর খেতে দেওয়া না হয়, তাহ'লে

পরের ঘণ্টাধ্বনিতে তার লালা-ক্ষরণ ক্রমশঃ বন্ধ হবে। শিক্ষার ব্যাপারেও দেখা যায়, বাপ-মা অসতর্ক বা অবাঞ্ছিত-ভাবে সন্তানকে কোন বিষয়ে নিষেধ কর্‌লে—নিষেধ টেঁকে না।

৫। একাধিক নিয়ন্ত্রিত উত্তেজক-প্রয়োগে কোন অভ্যাস গঠিত হ'লে, একটি নিয়ন্ত্রণের অবসানে বা অভাবে অভ্যাসটি নষ্ট হয় না। এমন হ'তে পারে যে একটি প্রবল উত্তেজক নাই, তবুও প্রতিক্রিয়া একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল উত্তেজককে আশ্রয় ক'রে সমানভাবেই পুষ্ট আছে।

৬। নিয়ন্ত্রিত প্ররোচকের প্রতিক্রিয়ার—অর্থাৎ নব-লব্ধ অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পূর্বে যদি কোন বিকর্ষণ-মূলক নূতন অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, তাহ'লে অভ্যাসটি শিথিল হ'য়ে পড়ে। নূতন অবস্থা বা ব্যবস্থাটি যত দৃঢ় হয়, পূর্বার্জিত অভ্যাস ততই বেশী বাধা পায়। কিন্তু এই বাধা স্থায়ী হয় না। নূতন ব্যবস্থার পুনঃ পুনঃ অনুশীলন চালালে বাধা-সৃষ্টি কম্‌তে থাকে। একটি কুকুরকে মাংস খাইয়ে লোভ বাড়ানো হয়েছে। পরে এমন হয়েছে যে, মাংসভাণ্ড সাম্‌নে নিয়ে এলেই তার জিহ্বা দিয়ে জল পড়্‌ত। এর পরে তার একটি নূতন অবস্থা সৃষ্টি করা হ'ল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, ঠিক্ তার লালা-নিঃস্রাবের সময়ে, একটি গ্রামোফোন-রেকর্ড্ বাজানো হ'ল। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মাংস-দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় লালা-ক্ষরণকে যদি ধরা যায় শতকরা একশ' ভাগ, তাহ'লে প্রথম বারের গ্রামোফোন-বাদ্যের ফল হবে শতকরা দশ, দ্বিতীয় বারের শতকরা পঞ্চাশ, তৃতীয় বারের শতকরা পঁয়ষট্টি, চতুর্থ বারের পঁচাশী, পঞ্চম বারের শতকরা নব্বই, ষষ্ঠ বারের শতকরা চুরানব্বই এবং সপ্তম বারের শতকরা একশ'।

অর্থাৎ—

মাংস-দর্শন—>লালা-নিঃসরণ

গ্রামোফোন—>শব্দানুসরণ

মাংস-প্রদর্শন

+ গ্রামোফোন—>শব্দানুসরণ বেশী, লালা কম

সুতরাং গ্রামোফোন আংশিক বাধা জন্মায় লালা-স্রাবে। ক্রমশঃ গ্রামোফোনের প্রভাব ক'মে যায় এবং লালা-স্রাব প্রথম বারের মত হ'তে থাকে।

৭। এই থেকে প্রমাণ হয়, বাধা-সৃষ্টিকারী অভ্যাসেরও বাধা জন্মানো সম্ভব।

৮। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় অভ্যাস-সৃষ্টি তরুণ-কিশোরের পক্ষে যত সহজ-লভ্য, বয়স্কের পক্ষে তত নয়।

স্যাণ্ডিফোর্ড্ মানব-শিশুর বস্তু-পরিচয় সম্বন্ধে—পূর্বের মত একটি সূত্র তৈরী করেছেন। সে একটি রবারের বল্‌কে চিন্‌তে ও 'বল্' কথাটির অভ্যাস কর্‌তে যে মানস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে—তা নীচের গাঁথুনি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

Stimulus = উত্তেজক = উ

Response = অভ্যাস = অ

$উ_1$ (মা বল্‌ছেন—'বল্')—>$অ_1$ (শিশু বল্‌ছে 'বল্',—অনুকরণ-প্রিয়তা)

$উ_2$ ('বল্' দেখা)—>$অ_2$ (বল্ নাড়া-চাড়া করা)

$উ_1$+$উ_2$—>$অ_1$ ("বল্" কথাটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ)

$উ_2$ (বল্ দেখা)—>$অ_1$ ('বল্' কথাটি বলা, অর্থাৎ একটি অভ্যাসের অধিগম)

ফলকথা, বলের দর্শন ও উচ্চারণ সম্মিলিত হ'য়ে গেল। স্যাণ্ডিফোর্ড্ বলেন, মানুষের জন্মের পর থেকেই অনিয়ন্ত্রিত উদ্বোধক পদার্থ বা অবস্থা শত প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে অভ্যাস-গঠন করে। মানুষের বুদ্ধি ও ভাবানুগতার (Intelligence ও emotion) তারতম্য এই সব অভ্যাসের সমীকরণের উপর নির্ভর করে। যে-সব শিশুর মানস উপাদান উৎকৃষ্ট, তাদের পক্ষে সমীকরণ সহজ হয়। শিথিল অভ্যাসের পুনর্গঠনও সহজ হয়। দুর্বল-চিত্ত শিশু শেখেও কষ্টে, ভোলেও দেরীতে। সাধারণ ও অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন শিশুর স্নায়ু-তন্ত্র সুকোমল, অর্থাৎ অভ্যাস-গ্রহণের ও ধারণের পক্ষে অনুকূল। সুতরাং ওয়াট্সন্ সাহেবের আবিষ্কৃত ও বহু বিজ্ঞানীর অনুশীলিত reflex-তত্ত্ব শিক্ষা-জগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে। 'অহং'-তত্ত্ব মনো-বিজ্ঞানের রাজ্যের খানিকটা বাইরে, কিন্তু S—>R (উ—>ব্র)-তত্ত্ব আধুনিক যুগের শিক্ষকের এক মহামন্ত্র। শিক্ষকের প্রয়োজন এই তত্ত্বের সুবিবেচিত প্রয়োগ। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আলোচন (objective study) বিজ্ঞান-ধর্মী। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি শিশুর মনো-গঠন।*

* "We now know that very soon after birth the unconditioned bonds of children become conditioned in hundreds of ways. These new bonds we call conditioned responses and, later, habits or learning. The education of the child is largely a process of acquring in the first place conditioned reflexes, and then the more permanent associations and systems of conditioned reflexes that we call habits. Individual differences with respect to intellectual ability and emotional stability are largely due to the ease with which conditioned responses are formed and broken. In the well-endowed children these associations are easily made and re-made."

Sandiford—"Educational Psychology", Page 181.

এখনকার শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা বলেন, কাঁচের ঘরে চারা-গাছের মতন শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার দিন চ'লে গেছে। গলাধঃকরণ করিয়ে শিশুর মনে দুষ্পাচ্য বস্তু-সম্ভার প্রয়োগ করলে,—অনেক ক্ষেত্রে ফল হয় মারাত্মক। কয়েকটা বুলি শিখিয়ে অথবা পড়া-শুনার কঠিন চাপ দিয়ে—শিশুকে মানুষ করা যায় না। প্রথমে সতর্ক নজর রাখ্‌তে হবে তার স্বাস্থ্যের দিকে। তারপর তার মনের অবস্থা ও গতি বুঝে—শিক্ষা-দান। এ কাজে নার্সারী স্কুল বা শিশু-সদন অনেক ভাল, কেননা এখানে তার অভিজ্ঞতা-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত। এখানে প্রতিটি শিশুর মানসিক সম্পদের হিসাব-নিকাশ করা হয়, যার যতটুকু প্রয়োজন, তাকে তত-পরিমাণে সাহায্য করা চলে। শিশুর কাজে পরিবেশন-যোগ্য পাঠ্যতালিকা তৈরী করা হয়, তার ধী-শক্তির পরিমাপ ক'রে। স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের একটি সাধারণ ভিত্তি-ভূমি আছে; সে হ'চ্ছে সামাজিক পরিবেশ। সামাজিকতার ধারে তাদের স্বভাবের অমসৃণ কোণা-কানাচগুলি পালিশ হ'য়ে যায়। এর অর্থ এই, তারা শৃঙ্খলার মর্ম বুঝ্‌তে ও অভ্যাস করতে পারে। হ্যারিম্যান লিখেছেন,—"The aim of the modern school is to foster the maximum amount of mental growth in each child and at the same time to provide experiences in social living. The spirit of modern education is that the process should be one of direction and guidance rather than of autocratic coercion and repression." প্রতিটি শিশুর মানস বিবৃদ্ধি চাই। মি'লে মি'শে থাক্‌তে শেখানো চাই।

পীড়ন ও শাসনের পরিবর্তে চাই—সহানুভূতি-পূর্ণ পরিচালন। তাই, আধুনিক যুগের শিক্ষককে হতে হবে প্রবর্তক, শুধু প্রচারক নয়।

হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টিক্রম এই। পুরুষ ও প্রকৃতি সকল সৃষ্টির মূল। প্রকৃতির এক নাম প্রধান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয় এই প্রধান—আদ্যা সৃষ্টি-শক্তি। মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির বিকার। দশ ইন্দ্রিয়, চিত্ত এবং পাঁচ মহাভূত—এই ষোলটি বিকার। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি—এই মন। আয়ুর্বেদকার ভাবমিশ্র ব'লেছেন—'জীবাত্মা নিয়তো নিঘ্নো বসতি স্বান্তদূতবান্।" জীবাত্মা নিয়তির অধীন, শুভাশুভ কর্মের আয়ত্ত; মন তাহার দূত। গর্ভস্থ ভ্রূণের ভিতরেই এই দৌত্য আরম্ভ হয়। মাতৃ-গর্ভে শিশুর দেহ-গঠন মায়ের চলা-ফেরার উপর নির্ভর করে। শিশু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ইচ্ছা হয়ে ছিল—'মনের মাঝারে।' গর্ভবতী জননী বেশী রোদন-পরায়ণা হ'লে শিশু বিকৃত-লোচন হয়। মা দিবানিদ্রা দিলে শিশুর দিবানিদ্রা হয়; মা দৌড়ে' বেড়ালে শিশু চঞ্চল হয়। মা অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করলে জাতক বধির হয়। মা বেশী কথা বল্‌লে শিশু প্রলাপী হয়। জনন-শাস্ত্রের এ সিদ্ধান্তগুলো মনন-বিজ্ঞানের হেতুভূত। সমাজ-দেহের কতখানি পরিপুষ্টি থাক্‌লে—নির্দোষ বা স্বল্পদোষ মায়ের জাত তৈরী হয়, তা এ থেকেই বুঝ্‌তে হবে। 'নিঘ্ন' কথাটি conditioned reflex-এর ভূমিকা। উদীয়মান শিশু-বৃত্তিগুলিকে আয়ত্ত কর্‌লে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-জয়ের সম্ভাব্যতা থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি গুণাধীন। সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য বেশী। সত্ত্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময়। সত্ত্বগুণযুক্ত মনের লক্ষণ অনেকগুলি—আস্তিক্য, অক্রোধ, মিতাহার, মিত-বাক্য-প্রয়োগ, মেধা, বুদ্ধি,

ধৃতি, ক্ষমা, করুণা, জ্ঞান, নির্দম্ভতা, কর্মনিন্দাবিমুখতা, অস্পৃহা প্রভৃতি। রজোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—ক্রোধ, তাড়নশীলতা, বহুল দুঃখভোগ, অধিক সুখ-ভোগের ইচ্ছা; দম্ভ, কামুকতা, অলীক-বচনের ব্যবহার, অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্যাভিমান, সকল রকম আতিশয্যে আনন্দ, সমধিক ভ্রমণ-স্পৃহা প্রভৃতি। তমোগুণের লক্ষণ নাস্তিক্য, বিষণ্ণতা, আলস্য, দুষ্টমতি, নিন্দিত কর্মে প্রীতি, সর্বদা নিদ্রালুতা, সর্ববিষয়ে অজ্ঞান, ক্রোধান্ধতা এবং মূঢ়তা। সত্বগুণের বাহুল্য থাক্‌লেও ত্রিগুণ নির্মল স্ফটিকের মত। মানুষের অন্তশ্চৈতন্য চিৎ-ছায়ারূপে ঐ স্ফটিকখণ্ডকে রঙ্গীন করে। এর থেকেই ইচ্ছার উদ্ভব হয়। এই ইচ্ছাকে পরিচালিত কর্‌বেন শিক্ষক। এক একটি শিশু যে চিচ্ছক্তির কেন্দ্র, তার আত্মশক্তির সম্প্রসারণই শুধু শিক্ষকের করণীয়, এ বৈজ্ঞানিক সত্য ভারতবর্ষের সকল শাস্ত্র, কি দর্শন, কি আয়ুর্বেদ, কি তন্ত্র, এক-বাক্যে স্বীকার করে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ওয়াট্‌সন্‌-ওয়ারেনের মত শিশু-পরীক্ষাগারে কি কি পরীক্ষা ক'রছেন, তা আজ আমরা পাচ্ছিনা, তবে মূল সূত্রগুলির সন্ধান কিছু কিছু পাচ্ছি।

গর্ভোপনিষদে* দেখি, গর্ভস্থ সন্তান নবম মাসে দেহীর সব লক্ষণ পায়, ও "জ্ঞান-করণ-সম্পূর্ণ" হয়, অর্থাৎ তার চিচ্ছক্তি ও

* অথ নবমে মাসি সর্বলক্ষণজ্ঞানকরণসম্পূর্ণো ভবতি।
পূর্বজাতিং স্মরতি। শুভাশুভং চ কর্ম বিন্দতি।
পূর্বযোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া। আহারা বিবিধা
ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব
জন্ম চৈব পুনঃপুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে
কৃতং কর্ম শুভাশুভম্‌॥ একাকী তেন দহ্যেঽহং

ক্রিয়াশীলতা পরিপুষ্টি লাভ করে। সে পূর্বজাতি স্মরণ করে। শুভাশুভ কর্মের বোধ জন্মে। তখন সে ভাবে, কত মায়ের কত স্তন্যপান সে ক'রেছে, কত সহস্র-যোনি জন্মে জন্মে পরিভ্রমণ করেছে, পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান ক'রেছে, এখন একাকী সেইগুলোর ফলভোগ ক'রে দগ্ধ হচ্ছে। এখন সে দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন হয়ে কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রতিকার দেখ্‌তে পাচ্ছে না। যোনি থেকে প্রমুক্ত হ'লে অশুভক্ষয়ের জন্য সে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হবে, নারায়ণের ভজন-পূজন কর্‌বে। গর্ভ-মুক্তি ঘট্‌লে সে সাংখ্যযোগ অভ্যাস করবে এবং সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করবে। কিন্তু যোনিদ্বারে পৌঁছিবামাত্র মহৎ-দুঃখে পীড়িত হয়ে—বৈষ্ণব-বায়ুর সংস্পর্শে জন্ম-মরণের কথা বিস্মৃত হয়, আর কর্মের শুভাশুভত্ব বুঝ্‌তে পারে না। বিষ্ণু জগতের অধিদেবতা, তাই বৈষ্ণব-বায়ু বল্‌লে পার্থিব বায়ু বুঝ্‌তে হবে। গর্ভস্থ সন্তানের দেহে তিন প্রকার অগ্নি আশ্রিত হয়, জ্ঞানাগ্নি, দর্শনাগ্নি, কোষ্ঠাগ্নি। কোষ্ঠাগ্নি পীত, লেহ্য ও চোষ্যবস্তু পরিপাক করে। দর্শনাগ্নি নানা রূপের দর্শন করে। জ্ঞানাগ্নি শুভাশুভ কর্ম বুঝ্‌তে পারে। অর্থাৎ শিশুদেহে মনের জন্ম হয়। মন আত্মার দূত।

গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো
ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং
তৎ সাংখ্যং যোগমভ্যাস। অশুভক্ষয়কর্তারং
ফলমুক্তিপ্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং
ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্। অথ যোনিদ্বারং সংপ্রাপ্তো
যন্ত্রেণাপীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু
বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি
জন্মমরণানি ন চ কর্ম শুভাশুভং বিন্দতি ॥ ৪ ॥

গর্ভোপনিষৎ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে* আছে, মন জগতের কর্তা, মনই পুরুষ, মন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংলগ্ন হ'লে—মণির প্রতিবিম্বের মত তার স্থায়িত্ব। ব্রহ্মা প্রথমে বুদ্ধ্যাকাশ সৃষ্টি করেন, পরে ক্রমশঃ চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং আকাশ সৃষ্টি করেন। এই তিনটিই অনন্ত। চিদাকাশে—এক, দুই, তিন ক'রে বহু সৃষ্টি সম্ভব হয়। এদের স্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা। তিনিই ভূতজালের কল্পনা করেন। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ, জীব ও জড়, তাঁর কল্পনার প্রসব। মানুষের চিত্তে এই কল্পনার প্রতিভাস।

* ত্বং সৃষ্টেহ প্রজাস্তিষ্ঠ বুদ্ধ্যাকাশো হ্যনন্তকঃ।
চিত্তাকাশশ্চিদাকাশ আকাশশ্চ তৃতীয়কঃ॥ ৬
অনন্তাশ্রয় এবৈতে চিদাকাশপ্রকাশিতাঃ।
একং দ্বৌ ত্রীন্বহূন্বাপি কুরু সর্গাঞ্জগৎপতে॥ ৭
প্রতিভাসমুপায়াতি যদ্যদস্য হি চেতসঃ।
তত্তৎপ্রকটতামেতি স্থৈর্যং সফলতামপি॥ ১৭
চিত্তং হি প্রতিভাসাত্ম যচ্চ তৎপ্রতিভাসনম্।
তদিদং ভাতি দেহাদিস্বান্তং নান্যাস্তি দেহদৃক্॥ ২০
চিত্তমাত্মচমৎকারং তচ্চ তৎকুরুতে স্বতঃ।
যথাবৎ সম্ভবং স্বাত্মন্যেবান্তর্মরিচাদিবৎ॥ ২১
জড়াজড়ং মনো বিদ্ধি সংকল্পাত্ম বৃহদ্বপুঃ।
অজড়ং ব্রহ্মরূপত্বাজ্জড়ং দৃশ্যাত্মতাবশাৎ॥ ৩১
দৃশ্যানুভবসত্যাত্ম ন সদ্ভাবে বিলাসিতৎ।
কটকত্বং যথা হেম্নি তথা ব্রহ্মণি সংস্থিতম্॥ ৩২
সর্বত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্বং জড়ং চিন্ময়মেব চ।
অস্মদাদিশিলান্তাত্মা ন জড়ং ন চ চেতনম্॥ ৩৩
মনঃ পদার্থাদিতয়া সর্বরূপং বিজৃম্ভতে।
নানাত্মা চিত্তদেহোঽয়মাকাশবিশদাকৃতিঃ॥ ৪৭
দেহাদিদেহপ্রতিভারূপাত্ম্যং ত্যজতা সতা
বিচার্যং প্রতিভাসাত্ম চিত্তং চিত্তেন বৈ স্বয়ম্॥ ৪৮
চিতত্তাম্রে শোধিতে হি পরমার্থসুবর্ণতাম্।
গতেঽকৃত্রিম আনন্দঃ কিং দেহোপলখণ্ডকৈঃ॥ ৪৯
[যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে উৎপত্তিপ্রকরণে জীবাবতরণ-নামক একনবতিতম সর্গ]

জীবের অবতরণ সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, মন আদি পদার্থ, সেই জন্যে মন সব রকম রূপ গ্রহণ করে। নানা আত্মা চিত্তদেহ আশ্রয় করে। চিত্ত সৎ, অর্থাৎ স্থায়ী বস্তু, দেহপ্রতিভা তাহার স্থূল রূপ। দেহের মধ্য দিয়ে চিত্ত নিজেই তার আভাস বিচার করে। এই তাম্রের ন্যায় চিত্ত শোধিত হ'লে পরমার্থরূপ সুবর্ণে পরিণত হয়। তখন অকৃত্রিম আনন্দ জন্মে। দেহকে তখন উপলখণ্ডের ন্যায় মনে হয়।

সুতরাং দেহাশ্রয়ী চিত্তকে বিকশিত ও শোধিত করাই শিক্ষক ও আচার্যের কর্তব্য। তন্ত্রের বক্তব্যও তাই।

চেতন ও অবচেতন

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত mneme ও horme-কে নূতন ক'রে নাম দেওয়া যাক্, 'ধৃতি' ও 'স্মৃতি'। এই যুগ্ম ধর্ম নিয়ে চেতন মনের রাজ্য। এই রাজ্যের পশ্চাতে আছে—সুবৃহৎ অবচেতন মনোজগৎ। মানুষের ব্যক্তিত্বের দুই রূপ, একটি উপরের, একটি ভিতরের। এ দুয়ের সংঘাত মনোবিজ্ঞানীদের সাধনার বস্তু। উপরের মানুষটি সভ্য, শান্ত, পালিশ-করা, কিন্তু ভিতরে দানবের দার্ঢ্য। বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক—উভয়ের মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব দৃষ্ট হয়। শিক্ষকের কারবার অপ্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে। পাশ্চাত্য জগতে ফ্রয়েড্ (Freud) এই তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য বিশ্লেষণ করেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। আমরা খুব সতর্ক থাক্লেও অনেক সময়ে দেখি, হয়ত হাত থেকে কোন জিনিস পড়ে গেল, হয়ত চিঠি লিখ্তে গিয়ে তাতে কালি পড়ে গেল। ঘটনা তুচ্ছ, কিন্তু তলিয়ে দেখ্লে আমার বা কারুর অবচেতন রাজ্যে পৌঁছিতে হবে। সেই রাজ্যে যে সব ক্রিয়া চল্ছে, সজাগ প্রহরীকে উপেক্ষা ক'রে, উপরে তার সামান্যতম বিকাশ হচ্ছে। স্কুলে কোন ছেলে হয়ত তার লেখার খাতা কালি ফেলে ফেলে অনবরত নোংরা কচ্ছে,—এর গভীরতম কারণ খুঁজলে পাওয়া যাবে তার বিদ্রোহী মনে। সে স্কুলের শাসন ও শৃঙ্খলাকে মান্তে চায় না—মনে-প্রাণে, কিন্তু তার অভ্যস্ত চেতন সংজ্ঞায় এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে না, চাপা থাকে। অতিরিক্ত নিষ্ঠাবান্ বা নিষ্ঠাবতীদের মনের বিশ্লেষণ কর্লে দেখা যাবে, ভিতরে

আছে অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্খা অথবা কোন গোপনীয় অপরাধ। আবার, বিশেষ লক্ষ্য কর্‌লে বোঝা যাবে, যখন আমরা অন্যের চরিত্রের কোন একটি দুর্বলতাকে বিশেষভাবে বিরক্তিকর মনে ক'রে ঝাঁজালো মন্তব্য করি, তখন প্রকৃতপক্ষে হয়ত নিজেদেরই সেই ত্রুটিকে আস্ফালনের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখ্‌ছি।

কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময়ে মনের অন্তর্মুখীনতার ফলে চুপ্‌-চাপ্‌ থাকে, একা থাক্‌তে ভালবাসে। কেউ বা দিবা-স্বপ্ন দেখে। কেউ খিট্‌-খিটে হয়, কেউ মুখ ভার ক'রে ব'সে বা শুয়ে থাকে। কোন কোন তরুণ বা তরুণী ভ্রাম্যমান হয়ে মনকে হাল্‌কা কর্‌তে চায়। কেউ বা মিথ্যাভাষণে ওস্তাদ হ'য়ে উঠে। কেউ আবার চুরি-বিদ্যায় অভ্যস্ত হয়। সব-চেয়ে মুস্কিল হয়, যখন দলবদ্ধ হয়ে তারা কোন-কিছু ক'রে বসে।

শিশু, তরুণ ও বয়স্ক, সকলেরই মনের দুইটি কোঠা; একটি উপরের, আর একটি নীচের। উপরেরটি চেতন, নীচেরটি অবচেতন রাজ্য। শিশুর মনে অবচেতন রাজ্যের প্রভাব অনেক বেশী। তখনও তার চেতনা সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয় নি। অর্থাৎ বহির্জগতের সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে আত্ম-বোধ প্রশস্ত হয় নি। আত্ম-বোধ প্রসারের ধাপগুলি এই—ধৃতি, স্মৃতি, সৃতি, তারপর প্রকৃতি। কথাগুলি একটু পরিষ্কার করা যাক্‌। জাতি ও বংশ-গত প্রবৃত্তি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তৈরী থাকে। নূতন-পাওয়া মনে নূতন জগতের পরিবেশে শিশু সেগুলি ধারণ ক'রে ব'সে থাকে। রাস্তা তৈরী হয়, এর নাম ধৃতি। স্মৃতি তার সহায়ক। ইংরেজিতে একে বলা হয় mneme। অবচেতন রাজ্য থেকে চেতনার রাজ্যে একে

টেনে তোলা হয়। চেতনার রাজ্যে মনের গতি, অর্থাৎ স্মৃতি প্রধান অংশ। এই অংশটি মনকে সব জিনিসের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ ক'রে তোলে। যেখানে বে-খাপ্পা, সেখানে অসম্পূর্ণতা, সেখানেই সংঘাত। এই মনঃ-সংঘাত অবচেতন-তত্ত্বের গোড়ার কথা।

আমরা শব্দ-সমুদ্রের মধ্যে থাক্লেও যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দই আমাদের অধিগত বা আয়ত্ত হয়, তেমনি অবচেতন রাজ্যে ঘুরে ফিরেও তার অস্তিত্ব-বোধ আমাদের ততখানি হয়, যতখানি আমাদের চেতনা বহির্জগতের মধ্য থেকে গ্রহণ কর্তে পারে। এই গ্রহণ-ব্যাপারে একটি প্রহরী থাকে, সে এই দুই রাজ্যের দৌত্য সম্পাদন করে। ফ্রয়েড্ তার নাম দিয়েছেন areberus. এর মানে, ভিতরের আমিটা বাইরের আমির বিরোধিতা করে। বিরোধিতা যেখানে প্রবল, সেখানে বাইরের আচরণে বিকার, অর্থাৎ বিপরীত আচরণ প্রকটিত হয়। সেই জন্যে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ কর্লে দেখা যাবে, যে তরুণ বা তরুণী একা একা থাক্তে চায়, তার যৌন প্রবৃত্তি প্রবল ; যে দিবা-স্বপ্ন দেখে, তার পূর্বাভ্যাস অধিক সঙ্গত ; যার মেজাজ খিট্-খিটে, সে নিশ্চয়ই তার নূতন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার চাইতে হেয়তর মনে করে। যে পলায়নে বা ভ্রমণে অভ্যস্ত, সে নিশ্চয়ই শাসন-বাঁধন ভালবাসে না। যে মিথ্যা বলে, তার সত্য-বোধ নিজস্ব গভীরতায় ডুব দিয়ে আছে। যে চুরি করে, তার নূতনের প্রতি লিপ্সা প্রবল। এ লিপ্সাকে অনেক তথাকথিত মানী, জ্ঞানী লোকও অতিক্রম কর্তে পারে না, দেখা গেছে। ধার-করা বই বেমালুম আত্মসাৎ করা অনেক প্রকৃতিস্থ লোকের

দুর্নিবার্য্য বদভ্যাস। ভাড়া না দিয়ে রেল-কোম্পানীকে ঠকানো কিংবা আয়-কর বাঁচাতে মিথ্যে হিসাব দেওয়া—অনেক বড় বড় লোকের বাহাদুরীর কাজ। এ সব প্রশংসার কাজ নয়; সুতরাং ছেলেবেলা থেকে শিক্ষক বা অভিভাবক এ কু-অভ্যাসগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করবেন। কিন্তু, প্রশ্ন এই, এ অভ্যাসগুলি আসে কেন এবং কোথা থেকে?

ফ্রয়েড্ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এ জিনিসগুলির গোড়া অবচেতন রাজ্যে। যার মন স্বচ্ছন্দভাবে দুই রাজ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে না পেরে সংঘাত সৃষ্টি করেছে, তার ছোটকাল থেকে এই বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। শিক্ষক এ সকল বিষয়ে অবহিত না হ'লে কিংবা প্রতিকারের সহজ ও শোভন ব্যবস্থা না করলে তাঁর কর্তব্যের বিরাট্ ত্রুটি থেকে যাবে।

ফ্রয়েডের অত্যাশ্চর্য অনুশীলনের ব্যাপকতা মহাভারতের উপাখ্যানগুলির মত বিরাট্। তিনি তাঁর নিজের জীবনের ছোট, বড়, সব ঘটনার বিজ্ঞানসঙ্গত ও বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলি অলৌকিক উপাখ্যানের মত রোমাঞ্চকর। স্নায়ু-পীড়ার চিকিৎসকের কাজ শুরু ক'রে মনস্তত্ত্বের গভীর সমুদ্রতলে প্রবেশ করেছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রথম ব্যাখ্যাতা ব্রিল্ সাহেব। ফ্রয়েডের গ্রন্থাবলীর ইংরেজি তরজামা করতে গিয়ে ব্রিল্ সাহেব ভূমিকায় লিখেছেন, ফ্রয়েড্ প্রতি মানুষের ভিতরে তিনটি সত্তা দেখ্তে পেয়েছেন। একটি আদি (Id), একটি সমাজ ও আবেষ্টন-লব্ধ (Ego), আর একটি আদর্শ-স্থানীয় (super-ego)। আবার, conscious, unconscious, fore-conscious (pre-consci-

ous)—এই তিনটি অবস্থার বর্ণনা তিনি ক'রেছেন নিম্নরূপ। *অনুভূতির রাজ্য প্রথমটি ; কোন একটি নির্দিষ্ট কালে অনুভূত মনের ক্রিয়াগুলি অনুভূতি অর্থাৎ conciousness-এর সীমানায়। এর বিপরীত হ'ল unconsious, বা অব-চেতন। এ রাজ্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, বিশেষ ইচ্ছা বা যত্নেও এ রাজ্যের খবর চেতনার রাজ্যে টেনে তোলা যায় না। এখানে পাতালপুরীর অন্ধকার। hypnosis বা মোহমন্ত্র কিংবা psycho-analysis বা বিশেষজ্ঞের প্রশ্ন ব্যতিরেকে কোন লোক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, তার ভু'লে-যাওয়া স্মৃতি-প্রকোষ্ঠের দ্বারোদ্‌ঘাটন কর্‌তে পারে না। তবে, এই দুই রাজ্যের মাঝা-মাঝি এমন একটা অবস্থা আছে বা আসে, যাতে ভুলে-যাওয়া ঘটনার কিছু কিছু উপরের সৃষ্টি-স্তরে ভেসে আসে।

ডক্‌টর ব্রিল্ একটি মার্কিন যুবতীর উল্লেখ ক'রে বলেন, সে একটি যুবককে ভালোবাস্‌ত ; বরং বলা যায়, যুবকটিই তার প্রেম ভিক্ষা কর্‌ত পুনঃ পুনঃ। যুবতীর মা বরাবরই হুঁসিয়ার হ'তে বলেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন যুবকটি তার পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ

* "Freud conceives consciousness simply as an organ of perception. One is conscious or aware of those mental processes which occupy one at any given time. In contrast to this, the unconscious is utterly unknown and cannot be voluntarily recalled. No person can bring to light anything from his unconscious unless he is made to recall it by hypnosis, or unless it is interpreted for him by psycho-analysis. Midway between conscious and unconscious there is a fore-conscious or pre-conscious, which contains memories of which one is unaware, but which one can eventually recall with some effort."

[Introduction to The Basic Writings of Sigmund Freud—
Dr. A. A. Brill, P. 13]

করার জন্যে মেয়েটির উপর বলপ্রয়োগ করে, কিন্তু তার যৌন-ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে যায়, কেননা মেয়েটি কিছুতেই স্বীকৃত হয় নি। এর তিন বছর পরে মেয়েটির ফিটের ব্যামো, মাথা-ঘোরা প্রভৃতি শারীরিক বিক্রিয়া ঘটে। তার এই ব্যাধি প্রায় আড়াই বছর থাকে। ব্যাধির পরীক্ষাকালে ডক্‌টর ব্রিল্‌ দেখেছেন, ক্ষুধিত নর-পশু মেয়েটির যে যে অঙ্গে যেভাবে পীড়া দিয়েছে, তার সেই সেই অঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করেছে। মেয়েটি ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের, শিক্ষিত, আচারনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিপালিত। সুতরাং সে যতদিন পেরেছে, তার ইন্দ্রিয়-লালসা দমন ক'রে রেখেছে—ব্যাধি-সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত। সুসভ্য আধুনিকা ছিল সে, তাই তার **চেতন** মনে ভালবাসা দেখা দিয়েছিল সুসভ্য আবরণে। কিন্তু তার **অবচেতন** মনে যৌন-বৃত্তি মাতৃত্বের লোভে উন্মুক্ত হয়েছিল। সে ভেবেছিল, উদ্বাহ-বন্ধনে তার বৃত্তিকে সংযত রেখেই স্বাভাবিক জীবন যাপন কর্‌বে আর দশজনের মত। কিন্তু আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক আক্রমণে তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেল বাইরে। দ্বন্দ্ব বা সংঘাত তখনই আরম্ভ হ'ল। তার চেতন মন বল্‌লো, প্রেমিকের বলাৎকার অত্যন্ত বেশী দোষের, অব-চেতন মন বল্‌ছিল, এ বলপ্রয়োগ তার চাই। সংঘাত চল্‌লো কয়েক সপ্তাহ ; এই সময়টাতে কখনো সে আত্মসমর্পণ করেছে, কখনো বা আত্ম-দমন করেছে। অবশ্য সবই বিঘটিত ঘটনার জৃম্ভন। এ নোংরা কথা সে কাউকে বল্‌তে পারছিল না। কাজেই অনেক দিন পর গুমরানির ফলে হ'লো তার শারীরিক ব্যাধি। ফ্রয়েডের ভাষায় বল্‌তে হয়, তার আদি সত্তা (Id বা primitive self)

তার নৈতিক ও সামাজিক আত্মবোধকে, অর্থাৎ Ego বা ethical self-কে পরাভূত করেছে। তার শারীরিক ব্যাধি তার চেতন ও অবচেতন সত্তার দ্বন্দ্বের ফল। অভিঘাতের পর থেকে তরুণীর জীবন চল্‌ছিল—যেন স্বপ্ন। বিকারের বা ব্যাধির সময়ে সে তার প্রেমিকের সঙ্গে শেষ দেখার পুনরভিনয় কচ্ছিল। তার অবচেতন মনে একই সঙ্গে পৌরুষ ও নারী-ভাবের বিকাশ হচ্ছিল। তার বহিঃস্থ সংজ্ঞায় এ বিকাশের খবর হয় নি। মনশ্চিকিৎসকের কাছে তা ধরা পড়েছিল। এই মনশ্চিকিৎসার ইংরেজি নাম psycho-analysis এর উপাদান প্রশ্নের পর প্রশ্ন। চিন্তা-সূত্রের association বা সঙ্গতি—প্রশ্নগুলির প্রধান অবলম্বন।

ফ্রয়েড্ বলেন—normal (প্রকৃতিস্থ) এবং neurotic (স্নায়ু-পীড়িত)—এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ খুব বেশী পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা পরিমাণগত মাত্র। সুতরাং কি শিশু, কি বয়স্ক, সকলের মধ্যেই অবচেতন মনের ক্রিয়া চল্‌ছে। আমাদের সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাটো ভুল-চুক্‌গুলির ব্যাখ্যা তিনি তাঁর মনোবিকলের উপাদান দিয়ে ধর্‌তে পেরেছেন। এই ব্যাখ্যা-কার্যে রত হয়ে তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনব্যাপারে fore-conscious বা pre-conscious-এর প্রতিপত্তি বেশী।

তিনি বল্‌তে চান, মানুষের অবচেতন মনের অসম্পূর্ণ অভিলাষই 'স্বপ্ন'* হয়ে দেখা দেয়। স্বপ্নে যে অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাও

* 'The dream, according to Freud, represents the hidden fulfilment of an unconscious wish. But the wishes which it represents as fulfilled are the very same unconscious wishes which are repressed in neurosis. Dreaming is a normal function of the mind; it is the

স্নায়ু-বিকারে চাপা থাকে। স্বপ্ন প্রকৃতিস্থ লোকের একটি স্বাভাবিক মানস ক্রিয়া। স্বপ্ন নিদ্রার অভিভাবক, কেননা সে মানুষের দুষ্প্রাপ্য অভিলাষের উদ্বেগকে খানিকটা প্রশমিত করে; এইভাবে প্রশমিত না হ'লে—মানুষের উদগ্র উদ্বেগ তার সুষুপ্তির ব্যাঘাত জন্মায়। এই কার্যে স্বপ্ন সব সময়ে সফল হয় না। কখনও কখনও স্বপ্ন তার ন্যায্য সীমারেখা লঙ্ঘন করে। এত দূরে চ'লে যায় যে স্বপ্ন-দর্শী জাগ্রত হয়—তার আদর্শ সত্তার দ্বারা।

এখন, আসল কথা এই, যে-কোন বিকার বা বিপরীত আচরণের অনুধ্যান ও অনুশীলন কর্‌লে দেখা যাবে কতকগুলি মানস বিধি। এই বিধিগুলির সেরা—মানুষের **যৌন প্রবৃত্তি,** sexual instinct বা libido। শৈশবে থাকে ego libido; কৈশোরে narcistic libido এবং তরুণ ও পূর্ণ-বয়স্কের object libido—একই প্রবৃত্তির অবস্থান্তর। এই libido (lust) বা লাস্য শিশু-প্রকৃতির সবখানি। এর মানে, শিশুর অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ প্রায় এক। যৌন-প্রবৃত্তি শিশুর ভিতরে ঘুমিয়ে আছে। এই প্রবৃত্তিই তার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, সাথী—প্রভৃতির দিকে ভালবাসারূপে দেখা দেয়। শিশু যত বড় হয়, কৈশোর উদ্ভিন্ন হয়, যৌবনের রক্ত-রাগ তার মনকে অধিকার করে, ততই সে নিজের রূপে মগ্ন হয়। এই অবস্থার নাম narcistic libido। এর পর আসে

guardian of sleep in so far as it strives to release tensions generated by unattainable wishes—tensions which, if not removed, might keep the person from sleeping. The dream is not always successful in its efforts; sometimes it oversteps the limits of propriety; it goes too far; and then the dreamer is awakened by the super-ego.'

(Brill—Introduction—Page 14.)

পরকীয়া প্রীতি বা অভিসার। ডক্‌টর ব্রিল্ একে বলেন—object libido। এ তত্ত্ব ভাল ক'রে বুঝ্‌লে আমরা দেখ্‌তে পাই, শিশু, স্বাভাবিক লোক এবং অপ্রকৃতিস্থ লোক—সকলেরই যৌনবৃত্তি একসূত্রে গাঁথা। এই বৃত্তিকে শুধু প্রজননের সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ না কর্‌লে বোঝা যাবে, আত্মতৃপ্তি ও রস-বোধের তাগিদে আমাদের সব রকম শারীর ক্রিয়া—এই বৃত্তির ফল। শিশু, স্বাভাবিকভাবে সুস্থ লোক এবং বিকৃতমনা লোক—মূলতঃ একই বিধির অধীন হ'লেও আবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ-গুণে দোষ বা গুণ-যুক্ত হয়। সুতরাং, ফ্রয়েডের মহাভারত থেকে আমাদের সংগ্রহ কর্‌তে হবে, প্রধানতঃ শিশু ও কিশোরের অন্তর্জগৎ ও তার সুগভীর রহস্য।* ফ্রয়েড্ বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ যেমন আমাদের স্মরণে আসে না, যৌন সংস্কার তেমনি বাল্যকালে বা শিশুকালে যে ভাবে থাকে, পূর্ণ বয়সে তা লোকে ভুলে যায়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন, নব-জাত শিশু যৌন-বৃত্তির বীজ জন্মের সাথেই নিজ দেহ-মনে বহন করে, পরে কিছুদিন ঐ বৃত্তি চাপা থাকে; তারপর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে

* "It seems certain that the new-born child brings with it the germs of sexual feelings which continue to develop for sometime and then succumb to a progressive suppression, which may in turn be broken through by the regular advances of the sexual development or may be checked by individual idiosyncracies. Nothing is known concerning the laws and periodicity of this oscillating course of development. It seems, however, that the sexual life of the child mostly manifests itself in the third or fourth year in some form accessible to observation."

Freud—Infantile Sexuality—P. 583.

সেই নিবৃত্তির অবসান হয়, আবার কেউ কেউ নূতন নূতন ভাবে নানা রকমের বিকার প্রদর্শন করে। কতদিন এবং কি প্রণালীতে এই বৃত্তি-নিবৃত্তির ওঠা-নামা চল্‌তে থাকে, সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি বলেন, মানব-শিশুর তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষেই যৌন-সংস্কারের প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়। একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই, জার্মান ডাক্তার বেয়ার্ (Bayer) বহু বার পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে নব-জাত, অর্থাৎ সদ্যোজাত একটি কন্যার গর্ভাশয় তার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় মেয়ের গর্ভাশয়ের চাইতে আকারে বড়। ফ্রয়েড্ তাঁর গ্রন্থের পাদ-টীকায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

ফ্রয়েড্ বলেন, এই আংশিক নিবৃত্তি বা বিস্মৃতির কালেই শিশুর মনে কতকগুলি মানস-শক্তির সঞ্চার ও বিকাশ ঘটে। এই শক্তিকে স্বভাবজাত বিচার-শক্তি—(মানস শক্তি বা psychic forces) বলা চলে। নদীর বাঁধের মত এই নব-জাত শক্তি শিশুর যৌন-বৃত্তিকে বাধা দেয়। তখন লজ্জা, ঘৃণা, নীতি-বোধ আপনা-থেকে জন্মে। আমরা মনে কর্‌তে পারি, সভ্য জগতে শিক্ষার গুণেই এই লজ্জা-ঘৃণারূপ বাঁধ তৈরী হয়। অবশ্য, শিক্ষার গুণে তা হয় না, তা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরীর-যন্ত্রের (শারীর প্রক্রিয়ার) নিয়মেই এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষা ব্যতিরেকেও এ জিনিস সম্ভবপর হয়। শিক্ষা তখনই সার্থক হয়, যখন প্রকৃতির এই নিয়মকে শিক্ষা পরিমার্জিত ও গভীর ক'রে তোলে।* প্রকৃতির আনুগত্য রক্ষা ক'রে শিক্ষা-পরিচালনার কল্পনা থেকেই

* "It is during this period of total or at least partial latency that the psychic forces develop, which later act as inhibitions on

Behaviourism-এর সৃষ্টি। এই জন্যে ফ্রয়েড্‌কে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জনক বলা যেতে পারে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ সাহেব বলেছেন, ফ্রয়েড্‌ ও তাঁর সমশ্রেণীর মনোবিজ্ঞানীদের সাধনার ফলে—সহজ মানুষ এবং সাধারণ-শ্রেণীর বহির্ভূত মানুষের মনের ক্রিয়া-কলাপের অনেক সূত্র আবিষ্কৃত ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। অসাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর্‌লে মানুষের ভবিষ্যৎ বিকাশের অনেক ইঙ্গিত ধর্‌তে পারা যায়। প্রথমে দেখা যায়, অবচেতন রাজ্যের ক্রিয়া-কলাপ সহজ মানুষের চিন্তাধারার অনুরূপ। তারপর, প্রতিভার বিকাশ, ধর্মাচরণের নূতনত্ব, মরমী কবি ও ভাবুকদের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি, অসাধারণ মানুষের মেধা ও চরিত্রের রাজ্য। ফ্রয়েডের দল—এই রাজ্যের অধিবাসীদের মনের কোষ্ঠী তৈরী করেছেন। মানুষের দেহের উপর তার মনের অলৌকিক প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা ক'রেছেন। মনের সঙ্গে মনের অতি-প্রাকৃত দৌত্যের খবরাখবর করেছেন। আবার, সাধারণ পর্যায়ের নিম্ন-

the sexual life, and narrow its direction like dams. These psychic forces are loathing, shame, and moral and aesthetic ideal demands. We may gain the impression that the erection of these dams in the civilised child is the work of education; and surely education contributes much to it. In reality, however, this development is organically determined and can occasionally be produced without the help of education. Indeed education remains properly within its assigned domain if it strictly follows the path laid out by the organic, and only imprints it somewhat cleaner and deeper.

Infantile Sexuality—P. 583.

স্তরের মানুষেরও চরিত্র ও আচরণ ফ্রয়েডের দল বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন ক'রেছেন। তা থেকে নিরেট বোকা অথবা মাতালও বাদ যায় নি।

শিক্ষকের পক্ষে average বা সাধারণ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতখানি দরকার, abnormal বা সাধারণের বহির্ভূত যারা, তাদের সম্বন্ধেও প্রয়োজন ততখানি। * মানস-সম্পদে যারা হীন, তাদের নিয়েও শিক্ষকের চল্‌তে হবে, তাদের শ্রেণীভেদ করতে হবে, বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন কর্‌তে হবে, শিশুর মনোরাজ্যের খবর ভাল ক'রে নিতে গেলে, তার স্বপ্নরাজ্যের সংবাদ প্রয়োজন। শিশুর বাস্তব তার স্বপ্ন-জগতের প্রতিচ্ছায়া। তার স্বপ্ন (পূর্বেই বলা হয়েছে) তার অপূর্ণ অভিলাষের পরিপূরক। শিশুর স্বপ্নতত্ত্ব খুব জটিলতাময় নয়। কিন্তু তা থেকে পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের কর্ম-ধারায় প্রারম্ভিক লক্ষণ পাওয়া যায়। ফ্রয়েড্‌ তাঁর নিজের শিশু পুত্র-কন্যার স্বপ্নগুলির বিশেষ অধ্যয়ন ক'রে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন ফ্রয়েড্‌-পরিবার একটি ছোট পাহাড়ের টিলায় বাস কর্‌তেন। সেখান থেকে ডাক্‌ষ্টিন্‌ পাহাড়ের শোভা খুব স্পষ্ট হ'য়ে মনে দাগ ফেল্‌তো। বাড়ী থেকে তাঁরা একটি অধিত্যকার মধ্য দিয়ে ভ্রমণে চলেছিলেন। দৃশ্যপট ঘন ঘন পরিবর্তিত হচ্ছিল। ফ্রয়েডের পাঁচ বছরের শিশু-পুত্র খুব বিরক্ত হয়েছিল,

* 'That which separates the normal from the abnromal is but a relative increase in a single component of the sexual instinct and what course it may take during development."

Freud—Ibid—P. 603 (foot-note).

কেননা ডাক্‌ষ্টিন্ পাহাড় সে পাচ্ছিল না। যখনই তার বাবাকে জিজ্ঞেস্ করে, তখনই শোনে—এটা নয়, পাহাড় বহু দূরে। বিরক্ত হয়ে সে চুপ্ ক'রে থাকে। একদিন ভোরবেলায় সে উৎফুল্ল হয়ে তার বাবাকে বলে, "বাবা, কাল্ স্বপ্নে আমি ডাক্‌ষ্টিন পাহাড়ে উঠে আমাদের বাসা দেখেছি, যেখান থেকে আমরা দূরবীণ দেখ্‌তুম্।" স্বপ্ন তার ইচ্ছার পরিপূরক হয়েছিল। ছোট ছেলে; বর্ণনা বেশী কিছু কর্‌তে পারল না। তবে খুসী হয়েছিল খুব।

ফ্রয়েড্ গবেষণার সূচনা পেলেন।

গবেষণার একটি সূত্র এই, প্রতি স্বপ্ন-দৃষ্টি কিংবা স্বপ্নে অনুভূত বস্তুর দুইটি রূপ,—একটি প্রকাশ্য, অপরটি অপ্রকাশিত বা অবলুপ্ত। দ্বিতীয় সূত্র এই, প্রতি স্বপ্নের একটি অংশের দ্বারা ইচ্ছা-পূরণ হয়; অপর অংশটি পূর্বোক্ত ইচ্ছার উপরে খবরদারি করে অথবা ঐ স্বপ্নের ঈপ্সিত বস্তুকে বিকৃত করে। এ অবস্থায় একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক। যেখানে স্বপ্ন প্রার্থিত বিষয়কে ভয়ঙ্কর ক'রে তোলে, সেখানে কি ক'রে বলা চলে সে স্বপ্ন ইচ্ছার পরিপূরক বা রূপান্তর মাত্র?

ফ্রয়েড্ লিখেছেন, একদিন একটি বুদ্ধিমতী মহিলা তাঁকে এসে জিজ্ঞেস্ করেন—"মশাই, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তার বিষয়-বস্তু আমার ইচ্ছাকে ভেঙ্গে-চূরে দিয়েছে। কাজেই আপনি যে বলেন, স্বপ্ন মনের গোপন অভিপ্রায়ের বহিঃ-প্রকাশ, এ কথা খাটে না। আমি স্বপ্নে একজন বান্ধবীকে খাওয়াব ব'লে স্থির করি। দেখি, ঘরে 'স্যামন'-মাছ ছাড়া পাতে দেওয়ার মত আর কিছু নেই। ভাবলাম, বাজারে যাই, কিন্তু তখ্‌খুনি মনে হ'ল, সেদিন রবিবার,

বাজার বন্ধ। তখন ভাব্‌লাম, ফোন ক'রে কোন পাইকারের কাছ থেকে কিছু জোগাড় করি। দেখি, ফোন্‌টা বিগ্‌ড়ে গেছে। শেষে বান্ধবীকে খাওয়ানোর প্রস্তাবে ইস্তাফা দিতে হ'ল।"

ফ্রয়েড্‌ তাকে বল্‌লেন, সাধারণতঃ অতি রাত্রির স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্বদিনের অভিজ্ঞতার কিছু রেশ বা লেজুড় থাকে।

মহিলা বল্‌লেন, তাঁর স্বামী একজন মাংস-বিক্রেতা। স্বপ্নের ২।৩ দিন পূর্বে তিনি স্ত্রীকে বলেন যে তিনি বড় বেশী মুটিয়ে গেছেন, সুতরাং চিকিৎসা ক'রে চর্বি কিছু কমাতে হবে। তিনি স্থির করেছেন, তখন থেকে রোজ ভোরে উঠবেন, ব্যায়াম করবেন, খাওয়া-দাওয়ায় হুঁশিয়ার হবেন, আর, বিশেষ ক'রে, কোনদিনই কোন বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবেন না। কথাপ্রসঙ্গে মহিলা আরও বল্‌লেন, তাঁর স্বামীর সঙ্গে একজন চিত্রশিল্পীর বন্ধুত্ব হয়। সেই চিত্র-শিল্পী নাকি তাঁকে বলেছেন যে মাংস-বিক্রেতা ভদ্রলোকটির, অর্থাৎ মহিলাটির স্বামীর মুখের ভাবাভিব্যক্তি এত সুন্দর যে, তিনি একটু স্থির হ'য়ে বস্‌লে তাঁর তুলি চল্‌তে পারে। স্বামী 'পোজ্‌' নিতে একেবারে অস্বীকার ক'রে, ব্যঙ্গচ্ছলে, স্ত্রীকে দেখিয়ে দেন। স্ত্রী স্বামীর সোহাগিনী ছিলেন। মহিলার অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল, হরিণের মাংস-মাখানো সন্দেশ খেতে। স্বামীর কাছে কোন দিন সে-কথা তোলেন নি। মজা দেখ্‌ছিলেন, আপন ইচ্ছায় তিনি কোন প্রস্তাব করেন কি না।

তখন ফ্রয়েড্‌ মহিলাটির কাছ থেকে ঐ স্বপ্ন-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্যে আরও কিছু কথার বা প্রশ্নের চাপ দিলে তিনি বলেন যে, স্বপ্ন দেখ্‌বার আগের দিনে তিনি তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে

যান। তাঁর স্বামী—এই বান্ধবীটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বদাই ক'রে থাকেন। মহিলা সেই জন্য তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। বান্ধবীটি রোগা ও হ্যাংলা, অথচ তাঁর স্বামীর পছন্দ মোটা-সোটা মেয়ে মানুষ। কথায় কথায় বান্ধবীটি বলেন, তাঁর মোটা হ'তে বড় ইচ্ছে করে। তিনি নাকি এ-ও বলেন, "আপনাদের বাড়ীতে আবার কবে নেমন্তন্ন হচ্ছে? আপনারা বড় ভাল খান।"

ফ্রয়েড বলেন, "আপনার তা হ'লে ইচ্ছে হয়েছিল বল্‌তে যে তিনি যেন আপনাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে শীগ্‌গির মোটা হন আর আপনার স্বামীর মনোহরণ করেন। তাই কি?—না, আপনার মনে হ'ল, আর কোন দিনই খাওয়ানোর আয়োজন কর্‌বেন না? আপনার স্বপ্ন, স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে খাবারের আয়োজন আপনি কর্‌তেই পারেন না, কেননা তাতে আপনার বান্ধবীর শীর্ণ দেহে মাংস-সঞ্চার হবে—আর আপনার স্বামি-সৌভাগ্যের অপচয় ঘট্‌বে। আর, আপনার স্বামী নেমন্তন্ন খাবেন না, এর মানে এই যে লোকে অন্যের অন্ন-ধ্বংস ক'রে মাংসল হতে চায়;—কেমন? আচ্ছা, স্যামন-মাছের চেহারা আপনি স্বপ্নে দেখ্‌লেন কেন?" মহিলা উত্তরে বল্‌লেন, ঐ মাছ তাঁর বান্ধবীর বড় প্রিয়। ফ্রয়েড্‌ মহিলাটিকে চিন্‌তেন। তিনি বল্‌লেন, যে কারণে-পূর্বোক্ত মহিলা সন্দেশ খেতে ইচ্ছুক, চাইতে নারাজ, তাঁর বান্ধবীটিও তেমনি স্যামন-মাছ খেতে ইচ্ছুক, চাইতে নারাজ। মনোবিকলনের সূত্রে মিলন দেখা গেল।

এই ঘটনার একটি নবতর ব্যাখ্যা ফ্রয়েড্‌ করেছেন। তিনি

লিখেছেন, স্বপ্নে মহিলা আত্ম-সত্তার বিলোপ করেছেন,—বান্ধবীর সত্তার মধ্যে। ফ্রয়েডের ভাষা এই—

"The dream becomes capable of a new interpretation if in the dream she does not mean herself, but her friend, if she has put herself in the place of her friend, or, as we may, has *identified* herself with her friend. * * * * ..."

সুতরাং স্বপ্নের মূল উপাদানের দ্বিতীয়াংশ দৃশ্যতঃ আপাত-বিরোধী হ'লেও প্রথমাংশের সহিত তার মিলন-গ্রন্থি দৃঢ়। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত এই, স্বপ্নে যাতনা-দায়ক যা-কিছু, তা ইচ্ছারই পরিপূরক।*

বয়স্কদের প্রসঙ্গ ছেড়ে আবার শিশু-রাজ্যে ঘু'রে আসা যাক্। শিশুদের ক্রোধ ও হিংসা-বৃত্তি উপেক্ষণীয় নয়, যদিও আমরা বিচারকের ভাষায় বলি, ছেলেটা 'দুষ্ট'—অর্থাৎ 'নষ্ট' নয়, অর্থাৎ 'naughty', "wicked" নয়। একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে কম হিংসুটে হয় না, বিশেষ ক'রে আপন ভাই-বোন্‌দের বেলায়। এর কারণ, তারা 'আত্ম-চৈতন্য' কেবলি লাভ করেছে ; তাদের আত্ম-বোধের তাগিদ্ বড্ড বেশী। কিন্তু সদ্-বৃত্তির স্ফুরণও এই সময়েই হয়। দার্শনিক Meynert বলেন, শিশুদের এই বয়সে সদ্-বৃত্তির বিকাশ হ'লে—শিশুর Secondary ego (অর্থাৎ, 'বিশুদ্ধ' আত্ম-বোধ) তার Primary egoকে (অর্থাৎ, 'অপরিশুদ্ধ' আত্ম-বোধ-কে) অভিভূত ক'রে ফেলে।

*"Dreams with a painful content are to be analysed as wish-fulfilments."
" P. 235.

ফ্রয়েড্ লিখেছেন, কোন শিশু তার নবাগত ভাই বা বোনের জন্মকে খুব ভাল চোখে দেখ্তে চায় না। তাঁর এক আত্মীয়-কন্যা তার চার বছরের ছোট বোনের জন্মদিনে মন্তব্য ক'রেছিল—"আমি আমার লাল টুপিটি কিন্তু ও-কে দেব না।" পরে উভয়ের মধ্যে বেশ ভাব হয়েছিল। ফ্রয়েড্ আর একটি তিন বছরের মেয়ের কথা তাঁর 'মহাভারতে' তুলেছেন। সে নাকি তার নব-প্রসূত প্রতিদ্বন্দ্বীকে গলা টিপে মেরে ফেল্তে গিয়েছিল।

ফ্রয়েড্ বলেন, শিশুদের স্বপ্ন অনেক সময়ে বয়স্কদের স্বপ্নের চাইতে বেশী জটিল, আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে, বয়স্কদের স্বপ্ন শিশু-মনের উপযোগী অর্থাৎ জটিলতা-বর্জিত হয়।* এ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের দল ভারী। তিনি তাঁর মতাবলম্বী অনেকের নাম ক'রেছেন, যথা,—ফন্ হাগ্-হেল্মথ্, পাট্নাম্, র‍্যাল্টে, স্পীল্রীন্ প্রভৃতি। সুপ্রাচীন কালেও স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন—প্রথম টোলেমির রাজত্বকালে—চিকিৎসা-বিদ্ হেরোফাইলস্। তিনি মানুষের স্বপ্নকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রেছিলেন; দেবতাদের প্রেরিত, স্বভাব-জাত এবং বিমিশ্র। মনুষ্যেতর—পশুজাতির কোন স্বপ্ন সম্ভব কি না, এ সম্বন্ধেও ফ্রয়েড্ চিন্তা করেছিলেন এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র। অবচেতন-

* "It should be mentioned that young children often have more complex and obscure dreams, while, on the other hand, adults, in certain circumstances, often have dreams of a simple and infantile character."

Foot-note, P. 215. (Freud)

রাজ্যের অবতারণা করতে হচ্ছে—শিশু-চেতনার বিশ্লেষণের ব্যাপারে। আর, শিশু নিয়ে কারবার করেন শিক্ষক। অগ্রগতিশীল মানবজাতির পক্ষে যে নূতন নূতন পরিবেশ তৈরী হচ্ছে, শিক্ষা যে-ভাবে শিশু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠ্‌ছে, তাতে শিক্ষককে ফ্রয়েডের মত খানিকটা পাগল হ'তে হবে ; তাঁর 'নোট্'-বইতে থাক্‌বে—অনেক উদীয়মান জীবনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস—অনেক রোগ এবং অনেক চিকিৎসা। শিক্ষককে হ'তে হবে বড় দরের চিকিৎসক। এ গুরু-দায়িত্ব উপেক্ষার জিনিস নয়।

দেহ-যন্ত্র

চেতন ও অবচেতন মনের আধার মানব-দেহ। দেহ যন্ত্রবিশেষ, কিন্তু অন্য যন্ত্রের মত নয়। অন্য যন্ত্রের যেমন খোরাক দরকার, মানব-দেহ-যন্ত্রেরও দরকার। তবে, এ যন্ত্র অনেক বেশী জটিল। স্নায়ু-তন্ত্র এর ধারক ও নিয়ামক। জীবন-প্রবাহ রক্ষার জন্যে এ যন্ত্রের শ্বাস, জীর্ণ করবার শক্তি, জীর্ণ-দ্রব্য থেকে রসায়ন, অর্থাৎ শক্তি-সঞ্চার, রক্ত-সঞ্চালন প্রয়োজন। অন্য যন্ত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই; মানব-দেহ-যন্ত্রের বৃদ্ধি একটি অপূর্ব ঘটনা। শিশুর দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, যৌবন-সঞ্চার ও ওজোগুণ মানবেতর পতঙ্গে নেই। বৃদ্ধির কাল মানুষের সব চাইতে বেশী, কেননা তার প্রয়োজনও বেশী।

মানুষের স্নায়ু-তন্ত্রে অফুরন্ত পরিবর্তন সম্ভব। আবেষ্টনের প্রতিক্রিয়া নানাবিধ। দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই বিভিন্নতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। টেলিগ্রাফ্ বা টেলিফোনের সঙ্গে মানুষের স্নায়ু-তন্ত্রের তুলনা করা চলে। দেহের সমস্ত অংশ থেকে বার্তা পৌঁছে। যে কোন ইন্দ্রিয় থেকে খবর যায়। যেখানে খবরটা গুরুতর রকমের নয়, সেখানে মস্তিষ্কের অর্থাৎ হেড্-অফিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ দরকার হয় না। হেড্-অফিসের কাজ, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঙ্গতি-বিধান। এই সুব্যবস্থার গোড়াকার কথা বুঝ্‌তে হ'লে স্নায়ু-তন্ত্রকে তিন দিক্ থেকে

বিচার কর্‌তে হবে। এই তিনটিকে ইংরেজিতে বলা হয়—Peripheral Nervous system, the Central nervous system এবং the Autonomic system.

সমগ্র স্নায়ু-তন্ত্রের পরিধি যেখানে বিবেচিত হয়, সেই দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত প্রথমে। ইংরেজিতে একে বলা হয় periphery বা বহিঃস্থ স্নায়ু-বন্ধনী। সমগ্র দেহে অসংখ্য স্নায়ু-কোষ (cells) আছে। এদের যোগাযোগে দৈহিক ও মানসিক সব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বহির্জগতের যত-কিছু সাড়া, স্নায়ুর সাহায্যে পরিব্যাপ্ত ও পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যে-সব বস্তু গ্রহণ করে—স্নায়ু তাদের অনুভূতি বা সংবেদনের পরিবাহক। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্বাদ-গ্রহণ এবং স্পর্শ যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্-এর মাধ্যমে স্নায়ুরই ক্রিয়া। যে স্নায়ু-প্রবাহ কোন বস্তুর দর্শনে চক্ষুরিন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছায় তাকে অন্তর্মুখ (afferent) স্নায়ু বা নার্ভ্ বলা হয়। ঠিক তেম্‌নি, কাণ, জিহ্বা, নাসিকা ও চর্ম—যে-সব স্নায়ুকে ক্রিয়াশীল ক'রে তোলে এবং মস্তিকে সংবাদ পৌঁছিয়ে সংবেদন সৃষ্টি করে, সে-সব স্নায়ু অন্তর্মুখ। এই সব স্নায়ুর অপর নাম sensory,—অর্থাৎ সংবেদক স্নায়ু। আবার, ঠিক বিপরীত ক্রিয়া যে-সব স্নায়ুর দ্বারা ঘটে, অর্থাৎ যেগুলি মস্তিষ্ক থেকে প্রবাহিত হয়ে ঘাটে ঘাটে স্নায়ু-কোষগুলিকে সক্রিয় ক'রে তোলে এবং যার ফলে মানুষ দৈহিক বা মানসিক কর্ম-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে, তাদেরকে বলা হয় সংবাহক বা Efferent নার্ভ্। এদের কাজ মস্তিষ্কের আদেশ বা সন্দেশ-বাহন। তাই এগুলোর ইংরেজি নাম motor nerve, অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক স্নায়ু। এরা

বহির্মুখ। উভয় শ্রেণীর স্নায়ুর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এক শ্রেণীর স্নায়ু অন্য শ্রেণীর কাছে প্রতিঘাত জন্মায় না।

অন্তর্মুখ স্নায়ুকে সংগ্রাহক (Receptor) এ আখ্যাও দেওয়া যায়। এর কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে স্নায়ু-মণ্ডলী ক্রিয়াশীল হয়—তারা শুধু দর্শনানুভূতিই জন্মায়, শ্রবণ-ক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের পথ রুদ্ধ। তেমনি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে স্নায়ু-মণ্ডলী ক্রিয়াশীল হয়, তারা শুধু শ্রবণানুভূতিই সৃষ্টি করে, দর্শন-ক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের পথ রুদ্ধ। সব ইন্দ্রিয়ের বেলায় একই কথা। কেবল কতকগুলি ব্যাপারে—কোন কোন শ্রেণীর দৈহিক বৃত্তি স্পষ্টতঃ এ সব ইন্দ্রিয়ের সীমানার বাইরে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা-বোধ—দৈহিক বৃত্তি ছাড়া কিছু নয়; এরাও এক প্রকার অন্তর্মুখ স্নায়ুর ক্রিয়ার আভ্যন্তর প্রকাশ। কিন্তু এরা কোন বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের অনুগত নয়।

কোন জিনিস যখন আমরা হাত দিয়ে ধরি—অথবা পা দিয়ে ঠেলে ফেলি, তখন স্নায়ুর ক্রিয়া কি ভাবে হয়, আলোচনা করা যাক্। হাতের বা পায়ের পেশীগুলি তখন ক্রিয়াশীল হয়। সংবাহক বা ক্রিয়াত্মক স্বায়ু এই পেশীগুলিকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু প্রেরণার উৎস আছে মস্তিষ্কে। এই প্রেরণা, এই স্নায়ুর সক্রিয়তা, এই পেশীগুলির উত্তেজনা—আমাদের বাইরের অনুভূতির অগোচরে সম্পাদিত হয়। এই আভ্যন্তর ঘটনাগুলি পরম্পরা-ক্রমে ঘটে যাচ্ছে ব'লে—আমরা হাত বা পা চালাই। সুতরাং এই পেশী অথবা স্নায়ুগুলিকে ইংরেজিতে বলা হয় effectors, বা সম্পাদন-ধর্মী পেশী। এরা বহির্জগতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে।

যে-ভাবেই হোক্, স্নায়ুর কর্মক্ষেত্রের মৌলিক ভিত্তি—স্নায়ু-কোষ।

পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন, ইংরেজিতে, neurone। এক একটি স্নায়ু-কোষের র‍্যাস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম; কিন্তু দৈর্ঘ্য নানা প্রকারের। প্রতিটি স্নায়ুকোষে তিনটি ভাগ আছে। এদের ইংরেজি নাম, যথাক্রমে, cell body, axone এবং dendrite। বাংলায় এদের নামকরণ করতে গেলে বলা যায়, স্নায়ু-কোষ, স্নায়ু-অক্ষ এবং স্না-তন্তু। স্নায্বক্ষ বেশ দীর্ঘ, এমন কি, কয়েক ফুট্। তন্তুগুলি হ্রস্বাকার—অনেকটা গাছের ডাল-পালার মত। এরা নিতান্ত সরু, প্রায় চুলের মত। এই রকমের অসংখ্য স্নায়ু-কোষ দিয়ে মানব-দেহ গঠিত। মস্তিষ্কের দিকে—অথবা মস্তিষ্ক থেকে যত-কিছু ভাব বা ক্রিয়া-স্পন্দন ঘটে, তার অবলম্বন—এই স্নায়ু-কোষগুলি। প্রতি স্নায়ু-কোষে ভাব বা ক্রিয়ার—অর্থাৎ বার্তার ষ্টেশন। এরা যেন টেলিগ্রাফের ষ্টেশন। অদ্ভুত এদের যোগাযোগ।

স্নায়ু-তন্তুর কাজ ভাব ও ক্রিয়ার পরিবাহন। পরিবাহনের পূর্বে তারা ভাব ও সংবাদ গ্রহণ করে। পরিবাহিত ভাব ও সংবাদ (বা সংবেদন) অন্য স্নায়ু-কোষে পৌঁছিয়ে দেয়। অন্য স্নায়ু-কোষের স্নায্বক্ষ—অর্থাৎ স্নায়ু-কোষের অক্ষ-রেখায় পৌঁছিয়ে দেয়; সেইখানেই তার সংযোগ-স্থল। এই সংযোগ-স্থানের ইংরেজি নাম Synapse। সুতরাং একটি স্নায়ু-কোষের একদিকে স্নায্বক্ষ-বাহিত সংবাদ বা ভাবের স্পর্শ, অন্যদিকে তন্তু-বাহিত প্রসার (বিস্তৃতি) Synapse অর্থাৎ সংযোগ-স্থল পর্যন্ত। Synapse-গুলি রক্ষী বা প্রহরীর কাজ করে। তারা দুই শ্রেণীর স্নায়ুর (সংবেদক ও ক্রিয়াত্মক—Sensory ও motor nerves) পথ-সঞ্চারে দিগ্-ভ্রম দূর ক'রে দেয়। এই রক্ষিদল মানুষের স্নায়বিক ক্রিয়া-সমূহকে নিগড়ে বেঁধে রাখে।

ন্যায়-শাস্ত্রের কার্য-কারণের সম্পর্কের মত আমাদের দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারে S→R, (অর্থাৎ উত্তেজক→অভ্যাস) স্নায়ু-তন্ত্রের ব্যাপার। কতকগুলি বিষয়ে এই সকল দৈহিক ক্রিয়া (অর্থাৎ অভ্যাস) অনেকটা মস্তিষ্ক-নিরপেক্ষ। আমাদের নাকে কোন-কিছু উত্তেজক কারণ ঘট্‌লে হাঁচি আসে। হঠাৎ আলো দেখ্‌লে চোখ মিট্-মিট্ করে। এ রকমটা হয় এই জন্যে—যে হাঁচি অথবা চোখের চাউনিতে—সংবেদক ও ক্রিয়াত্মক স্নায়ুর গতি-পথ আমাদের জন্মের পর থেকে একই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে—বেশ বাঁধা-ধরা (mechanical) হ'য়ে গেছে। বিশেষজ্ঞগণ তাই এই রকমের স্নায়বিক ক্রিয়ার ইংরেজিতে নাম দিয়েছেন reflex action। আমরা এর নাম দিতে পারি "যান্ত্রিক ক্রিয়া"। এই রকম স্নায়বিক ক্রিয়ায় সংবেদক স্নায়ু থেকে ক্রিয়াত্মক স্নায়ুর দিকে প্রসৃত গতি-পথকে বলা যায়—যান্ত্রিক ক্রিয়ার বৃত্তাংশ (Reflex arc)। আমাদের কাসি, হাঁচি, চোখের চাউনি, শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস ছাড়ার অভ্যাসগুলি যান্ত্রিক ক্রিয়ার পর্যায়-ভুক্ত। যে-সব ক্রিয়া এ সকলের চাইতে জটিল, যেখানে বহু-সংখ্যক স্নায়ু-কোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, সেখানে মস্তিষ্কের প্রাধান্য। সেখানে যান্ত্রিকতার আধিপত্য নাই বল্‌লেও চলে। সেখানে স্নায়ু-ক্রিয়ার গতি-পথ দীর্ঘতর।

কেন্দ্রীয় স্নায়ু-বন্ধনীর (central nervous system) দু'টি অংশ; সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord) এবং মস্তিষ্ক (brain)। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না-কাণ্ডের অবস্থিতি। এই দীর্ঘ সুরঙ্গ-পথে বহু স্নায়ুর বাণ্ডিল্ আছে। এর কাজ দু'টি। প্রথমতঃ, চক্ষুরাদি

ইন্দ্রিয় থেকে যে সব প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সুষুম্না-কাণ্ড সেই প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও সক্রিয় ক'রে তোলে। এই সুড়ঙ্গ-পথে একত্রিশ জোড়া সংবেদক ও সংবাহক স্নায়ু আছে; অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুর সংযোগ-স্থল এখানেই। দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্ক থেকে অন্য অঙ্গে, ও অন্য অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে ভাব ও বার্তা চলাচলের এই সুড়ঙ্গ-পথটিই প্রশস্ত। বেতার-বার্তার ঢেউ যেমন "রিলে" করা হয় কোন বিশেষ কেন্দ্রে, তেমনি দেহের অন্য অঙ্গ থেকে যখন মস্তিষ্কে কোন ভাব বা বার্তা পেঁছে, তখন মস্তিষ্ক তাকে পাঠিয়ে দেয় সুষুম্না-কাণ্ডের অন্তর্গত স্নায়ু-কোষগুলিতে, তখন সেখান থেকে আবার তা সম্পাদন-ধর্মী পেশী-গুলিতে সঞ্চারিত হয়। এমনি ক'রে মস্তিষ্কের সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভবপর হয়।

এই সুষুম্না-কাণ্ডের মধ্যস্থতার ফলে—চর্ম ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থেকে ভাব ও আবেগের চলাচল ঘটে। আমাদের বসা, চলা, দৌড়ান, চর্‌কা-কাটা, সাইকেল-চড়া, প্রভৃতি অভ্যাস-গত যন্ত্র-ধর্মী ক্রিয়া-কলাপে সুষুম্না-কাণ্ডের বিশেষ আধিপত্য। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই spinal cord বা সুষুম্না-কাণ্ডের জন্যেই সাধিত হয়।

এবার আস্‌ছে মস্তিষ্কের কথা। কেন্দ্রীয় স্নায়ু-কাণ্ডের প্রধান অবলম্বন মস্তিষ্ক। অস্থিময় আধারের মধ্যে ওর অবস্থিতি। আধারের নিম্নাংশ ফাঁকা। ওর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক, অর্থাৎ তার সার-ভাগ, সুষুম্না-কাণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছে। মস্তিষ্কের (সোজা কথায়, মাথার ঘিলুর) চারটি অংশ; ইংরেজিতে—একের নাম, যথাক্রমে cerebrum (ঊর্ধ্বভাগ বা বৃহৎ মস্তিষ্ক), mid-brain

(মধ্যভাগ), cerebellum (পশ্চাৎ-ভাগ বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক), thalamus সহ medulla oblongota (সুষম্না-কাণ্ডের যোজক)। সমগ্র দেহযন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুর যত রকমের ক্রিয়া বা চলাচল আছে, মস্তিষ্ক (brain) সে সকলের ব্যবস্থাপন-কেন্দ্র ; এতে মানুষের সব রকম ভাব, চিন্তা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃহৎ মস্তিষ্কের দু'টি বৃহৎ ভাগ আছে ; দুই ভাগেরই ওপরে শ্বেতবর্ণের পরদা আছে। এই পরদাকে ইংরেজিতে বলে cerebral cortex (বৃহৎ মস্তিষ্কের কায়াবরক)। স্নায়ুকেন্দ্রগুলি এই ভারী পরদার মধ্যে অবস্থিত ; মানুষের মনন-ধর্মের প্রধান আশ্রয়-স্থল এখানে। দুই অংশে বিচ্ছিন্ন এই বৃহৎ-মস্তিষ্কে—বৃহৎ রাজ্যের অংশের মত অনেকগুলি অংশ আছে। ইংরেজি নাম lobe ; প্রতি অংশ এক এক ধরণের চিন্তা বা কাজের আধার-ভূমি। কোন অংশ শ্রবণ-ক্রিয়ার আধার ; কোনটি দর্শনেন্দ্রিয়ের চালন-কেন্দ্র ; কোনটিতে ঘ্রাণ-শক্তি, কোনটিতে বাক্-শক্তি আশ্রিত হয়। দীর্ঘকালের সাধনা ও গবেষণার পর এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও মস্তিষ্কের এক একটি অংশে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তির মূল শক্তি নিহিত, তবুও cerebrum বা বৃহৎ মস্তিষ্কের একটা সামগ্রিক অস্তিত্ব আছে, যার ফলে পৃথক্ ক্রিয়া ও অনুভূতির একীকরণ সম্ভবপর হয়। একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন,—"The several parts co-operate and the entire system works as a unity". * বৃহৎ মস্তিষ্কের কোন অংশে কোন বিকৃতি ঘট্‌লে, তার

* "Elements of Educational Psychology"—by H. R. Bhatia Chapter—III

ফল সমগ্র মস্তিষ্কে, তথা সমগ্র স্নায়ু-মণ্ডলীতে দেখা দেয়। বৃহৎ মস্তিষ্কের আবরক আধারটি মনের উঁচুদরের শক্তিগুলির ক্ষেত্র; mid-brain বা মধ্যাংশ শুধু মানুষের চলা-ফেরাকেই নিয়ন্ত্রিত করে। Cerebellum বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রধান কাজ মানুষের দেহকে খাড়া রাখা ও ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখা। এই অংশের ব্যত্যয় ঘটলে হাঁটা-চলা বন্ধ হয়ে যায়। এর নিম্নস্থিত Thalamus ভাগটি স্নায়ু-ক্রিয়ার উর্ধ্বগতির ষ্টেশন। আমাদের সব রকমের অনুভূতি ঐ ষ্টেশন দিয়ে চলা-ফেরা করে। অনেকে মনে করেন, আমাদের সমস্ত স্বভাব-জাত সংস্কার ও ভাব-রাশিকে নিয়ন্ত্রিত করে ঐ Thalamus-নামক অংশটি। এর নীচে আছে একটি যোজক, যা দুই মহাদেশকে সংযোজিত করে। এক মহাদেশ মস্তিষ্ক, আর এক মহাদেশ সুষুম্না-কাণ্ড (spinal cord)।

কালীতন্ত্রের টীকাকার তাঁর গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন,—"বহু বহু তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তি হইতে প্রাণবায়ু সঞ্জাত হইয়াছে। তন্ত্রকারগণ সেই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ বিদ্যুন্ময় পদার্থ বলিয়া কীর্তন করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য, কি আন্তরিক যন্ত্রের কার্য, শরীরস্থ যাবতীয় কার্যেরই প্রবর্তিকা হইয়াছেন। তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অসংখ্য শূন্য কিংবা বায়ু-বাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্ন। তাহার মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী ইচ্ছাশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী এই তিনটি নাড়ী প্রধানা। সেই সমস্ত ধমনী-মার্গে বিদ্যুন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি শরীরে এবং

শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। কোন কোন শারীরতত্ত্ববিৎ মহাত্মা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে জ্ঞানশক্তি-বাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী যে শিরা আছে, শরীর ছেদন করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অপরাপর শারীরতত্ত্ববিদ্ মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগ যাবৎ যে একটি শিরা সংযুক্ত আছে, তাহা ছেদন করিলেই রক্তের সঞ্চালন রহিত হইয়া যায়। ইহাতেই অনুমান হয় যে, ঐ ধমনী দ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালনী শক্তি সংযোজিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, মেরুদণ্ডাশ্রিত যাবতীয় ধমনীর মধ্যস্থিতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যে সমস্ত বাহ্যক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাই শরীরস্থ মূল বায়ু।" ষট্-চক্রভেদের নিগূঢ় অধ্যাত্ম-তত্ত্বে কিংবা প্রাচ্য শারীর-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হ'লে আমরা দেখ্‌তে পাব যে, আমাদের সমস্ত মনন-ক্রিয়ার আধার মেরুদণ্ডাশ্রয়ী ধমনী-গুলিতে। "ধমনী" কথাটি এখানে ব্যাপক। স্নায়ু-তত্ত্ব আলোচনায় সুশ্রুত এবং তাঁর টীকাকার ডল্লনাচার্য লিখেছেন, মানব-দেহে 'স্নায়ুমর্ম' ২৭টি। তার হিসাব এই :—৪টি আখ্য, ২টি বিটপ, ২টি কক্ষধর, ৪টি কূর্চ, ৪টি কূর্চ-শিরা, ১টি বস্তি, ৪টি ক্ষিপ্র, ২টি অংস, ২—বিধুর, এবং ২টি উৎক্ষেপ। এই নামকরণ বিস্ময়াবহ। প্রতিটি "সংজ্ঞার" ভেতরে—প্রজ্ঞার গভীরতা এবং অনুশীলনের ব্যাপকতা। গোটাকয়েক ইংরেজি নাম দিয়ে আমরা স্নায়ু-তত্ত্বের সব দিক্ প্রকাশ কর্‌তে পারি না। গভীরে ডুব্‌তে গেলে আমাদের অধ্যয়নের বিষয় হবে,—নাড়ী-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্রের শারীর-স্থান; তন্ত্রের দেহ-প্রসঙ্গ, ষট্-চক্রভেদের রহস্য-লোক।

সত্যিকারের শিক্ষক হবেন যিনি, তাঁকে জান্‌তে হবে এসব। জান্‌তে হবে এই জন্যে যে মানব-শিশু—এক-একটি শক্তির কেন্দ্র। এই শক্তি-বিষয়ে তাকে উদ্বোধিত কর্‌তে হবে—কতক তার জ্ঞাতসারে, কতক তার অজ্ঞাতসারে।

এখন আমরা আলোচনা কর্‌তে পারি—স্নায়ু-তন্ত্রের তৃতীয় ভাগ, অর্থাৎ autonomic system বা স্বনিয়ন্ত্রিত স্নায়ু-সংস্থা। এই স্নায়ুগুলি দেহের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের নিয়ামক; দেহীর মনের ওপর এদের প্রভাব অল্প—মস্তিষ্কের তুলনায়। রক্তসঞ্চালন, পরিপাক-ক্রিয়া এবং gland বা গ্রন্থিগুলির কাজ এই শ্রেণীর স্নায়ুর কর্মক্ষেত্র। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে এই স্নায়ুগুলি অবস্থিত; এদের তন্তুগুলি সর্বদেহে বিস্তৃত।

সুশ্রুত মর্মগ্রন্থির যে-সব নাম দিয়েছেন, ইংরেজি ভাষায় অতগুলি নাম পাই না। মোটামুটি যে-সব গ্রন্থি বা gland-এর নাম প্রচলিত, নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

Gland বা গ্রন্থি হ'তে রস-ক্ষরণ হয়। গ্রন্থি দু শ্রেণীর। কতকগুলিতে রস-ক্ষরণের নালী বা পথ আছে। কতকগুলিতে নেই। অশ্রু-বহা নালী, ঘর্ম-বহা নালী, জিহ্বা-রস বা লালা-স্রাবের নালী দিয়ে আমরা এক শ্রেণীর gland বা স্নায়ু-গ্রন্থির পরিচয় পাই। নালী-বিহীন গ্রন্থি থেকেও রস-সঞ্চার হয়; এরা নাকি রক্তস্রোতে hormone-নামক পদার্থ ঢেলে দেয়। এরা দেহীর গতি ও স্থিতি নিয়মিত করে, আর দেহীর সমস্ত emotion বা মনের ভাবকে প্রভাবান্বিত করে। আমরা দেখ্‌তে পাই, ভয় ও ভাবনা হ'লে মুখ শুকিয়ে যায়। জিহ্বার glandগুলি তখন তাদের ক্রিয়া বন্ধ

করে। ক্রোধ বা দুর্ভাবনা উপস্থিত হ'লে—পাচক-রস-ক্ষরণ ব্যাহত হয়; অর্থাৎ পাকাশয়ের গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হয়। আবার, চিত্তে প্রফুল্লতা এলে কিংবা বন্ধু-সংসর্গে আনন্দের উদয় হ'লে পাচক-রস-ক্রিয়া সহজ ও স্বাভাবিক হয়। তখন বুঝতে হবে, পাকাশয়ের gland ঠিক-মত কাজ কচ্ছে।

Endocrine gland-কে, আংশিক ভাবে, কুণ্ডলিনী শক্তি বলা যেতে পারে। মানুষের সমস্ত রকমের ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির ওপর এই gland বা গ্রন্থির প্রভাব। বিশেষজ্ঞ-গণ এই gland-গুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।—(১) Thyroid, (২) Pituitary, (৩) Suprarenal, এবং (৪) Gonad। এই গ্রন্থগুলির ক্রিয়ার আধিক্য কিংবা হ্রাস ঘট্‌লে—দেহীর সমগ্র জীবনের ওপর তার ফল ফলে। শুধু দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি নয়, দেহীর প্রকৃতি ও চরিত্রেরও তাতে পরিবর্তন ঘটে।

(১) Thyroid-গ্রন্থি মানুষের কাঁধের নীচে গল-নালীর কাছে থাকে। এর থেকে Thyroxin নামে পদার্থ বের হয়। তা সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তার মূল উপাদান iodine—আইওডীন। ব্যাধির প্রকোপে—এই গ্রন্থি নষ্ট হ'লে মানুষের কর্মোদ্যম, কর্মশক্তি এমন কি বুদ্ধি-বৃত্তিও বিনষ্ট হয়। কথায় কথায় ভুল হয়; কোন কিছুতেই চিত্ত নিবিষ্ট হয় না। শৈশবে এই গ্রন্থি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে—শিশুর শারীর ও মানস বিকাশে ঘোরতর বাধা জন্মে। আবার, এই গ্রন্থির ক্রিয়ার আধিক্যে শিশু কারণে-অকারণে খুসী হয়, ভীত হয় এবং কোপন-স্বভাব হয়। চঞ্চল ও খিট্‌খিটে মেজাজের হয়। এই গ্রন্থির আধিক্যে বালক বা শিশু অস্বাভাবিক রূপে লম্বা

হ'য়ে উঠে, কিংবা তার অঙ্গ-বিশেষ ঐরূপ বৃদ্ধি পায়। যে সব ছেলেমেয়ে কোন কিছু মনে রাখতে পারে না, যাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, বুঝতে হবে তাদের অধিকাংশেরই Thyroid গ্রন্থির ত্রুটি আছে।

(২) Pituitary গ্রন্থি মস্তিষ্কের নিম্নভাগে থাকে। শৈশবে যদি কারুর এই গ্রন্থি অধিক সক্রিয় হয়, তা'হলে প্রায় দেখা যায়, বয়োবৃদ্ধিকালে তার হাত, পা, মুখ খুব বড় হয়ে ওঠে, রাক্ষুসে ভাব হয়। কিন্তু অতিবৃদ্ধির ফল হয় বিষময়; গ্রন্থির শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরমায়ুরও ক্ষয় হয়; অর্থাৎ অকাল-মৃত্যু ঘটে।—আবার, শৈশবে যদি 'পিটুটারী'-গ্রন্থির সক্রিয়তা মাত্রার নীচে থাকে, তা'হলে মানুষ দৈত্য না হয়ে বেঁটে হয়। কিন্তু বেঁটে হলেও এ ধরণের মানুষ বুদ্ধি রাখে, সমাজে মিশতে পারে। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় "মিজেট্" (midget)। এরা আর এক শ্রেণীর মানুষের চাইতে ভাল। তারা যেমন খর্ব, তেম্‌নি কদাকার, তেম্‌নি বুদ্ধিহীন। এখানে মানুষ বলতে—বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী—বাদ যাচ্ছে না। শিক্ষক ও শিক্ষিকারা যাদের নিয়ে কারবার করেন, তারা দৈত্যের জাত, না বেঁটের জাত, তারা বুদ্ধিমান্ না বুদ্ধিহীন, তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল না অন্ধকার—আগে থেকে জান্‌তে পার্‌লে শিক্ষাদান-পদ্ধতির অনুকূল ব্যবস্থা ও অনুশীলন কর্‌তে পারেন, কেননা শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ শিক্ষাদানের পূর্বে বিশেষ প্রয়োজন।

মূত্রাশয়ের ওপরে যে স্নায়ু-গ্রন্থি আছে—তা থেকে "এড্রেনালিন্"-নামক রস নির্গত হয়। দেহীর মনের সব রকম ক্রিয়ার সঙ্গে এই গ্রন্থির নিবিড় সংযোগ। এ জিনিসটিকে দেহ থেকে সরিয়ে

ফেল্‌লে মৃত্যু ঘটে অবিলম্বে। দুর্বলতা অত্যধিক হয়, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ অকস্মাৎ কমে যায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিল হ'তে থাকে। এই গ্রন্থির ক্রিয়ার মাত্রাধিক্য ঘট্‌লে, পুরুষ তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়, আর স্ত্রীলোক পুরুষোচিত আকৃতি, প্রকৃতি, এমন কি কণ্ঠস্বরও পায়।

এ বিষয়ে সর্বশেষ আলোচ্য স্নায়ু-গ্রন্থি আমাদের জননেন্দ্রিয়ে। ইংরেজি নাম gonads। পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ফল যে মানব আর মানবী, তা না বল্‌লেও চলে। কি দেহে, কি মনে—এরা যে পৃথক্ জাত, তা শিশুকেও বোঝাতে হয় না।

দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়ায় যথেষ্ট জটিলতা আছে ; বড় সূক্ষ্ম তার গতি-বিধি। তবে একটি মূল্যবান্ কথা এই, স্নায়ু-গ্রন্থি কিংবা সুশ্রুতের ভাষায় মর্ম-গ্রন্থি, পৃথক্ হয়েও এক। তার মানে, এদের ক্রিয়া অন্যনিরপেক্ষ নয় ; পরস্পর সাপেক্ষ। একজন প্রকৃতিস্থ পুরুষ বা নারীর দেহ-মনের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং শ্রী—স্নায়ু-ক্রিয়ার সামঞ্জস্যের ওপরে নির্ভর করে। যেখানে অসামঞ্জস্য, সেখানেই সৌষ্ঠবময় বিকাশের বিলোপ। সুতরাং শিক্ষককে এ সম্পর্কে অবহিত হ'তে হবে। শিক্ষক মনের চিকিৎসক ; কিন্তু তাঁকে, প্রয়োজন হ'লে, দেহের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে। সময় বুঝে, এড্রেনালিন ও আইওডিনের প্রয়োগ, দরকার হ'লে থাইরয়েড্ গ্রন্থির নূতন সংযোজন করিয়ে নিতে হবে তাঁকে—উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা—উপযুক্ত কালে। দেহ-যন্ত্রের প্রতিবিধানে শিক্ষককে রাষ্ট্র-যন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়ে সচেতন এবং তৎপর হ'তে হবে—নূতন মানব-সমাজের নব-বিধানে।

বুদ্ধির পরিমাপ

মানুষের বুদ্ধির তারতম্যের হিসেব করা বরঞ্চ সহজ, কিন্তু "বুদ্ধি" কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। ইংরেজিতে 'Knowledge' এবং 'wisdom'—দু'টি কথার অর্থ এক নয়। প্রথমটি খণ্ডিত তথ্যের জ্ঞান, পরেরটি সঞ্চিত এবং পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে চল্‌তে পারে যে মন, তাকেই বলা যায় বুদ্ধিমানের মন। অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্ বলেন, বুদ্ধি মনের একচ্ছত্র অধিপতি। বিনেট্ সাহেব বলেন, বুদ্ধি হচ্ছে সেই সাধারণ জ্ঞান—যা মানুষকে কর্মে প্রেরণা দেয়, অবস্থার ওঠা-নামায় ভেঙ্গে পড়ে না, বিচারশক্তি সৃষ্টি করে এবং যুক্তির প্রাধান্য মেনে নেয়। টার্‌ম্যান্ বলেন, যে লোক যত পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা কর্‌তে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্। থর্ণ্‌ডাইক্ বুদ্ধির সংজ্ঞা-বিধান কর্‌তে গিয়ে বলেন,—ও জিনিসটি সত্যের প্রতিধ্বনি প্রতিক্রিয়া মাত্র। নানা মুনির নানা মত থাক্‌লেও—একটি বিষয়ে সবাই একমত। নূতন নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সমাধান কর্‌তে পারা ও সেই ভাবে চলা—বুদ্ধির লক্ষণ। বুদ্ধি—একটি সমষ্টি-গত পদার্থ,—মানুষের জন্ম-লব্ধ সম্পৎ। বুদ্ধি মানুষের মনের অতন্দ্র অবস্থা।

স্পীয়ারম্যান লিখেছেন, বুদ্ধি মনের রাজা ; অর্থাৎ মনের অন্যান্য ধর্ম বুদ্ধির অধীন। সে হিসেবে থর্ণ্‌ডাইকের মত বিপরীত।

কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার সমষ্টিগত অবস্থানের নাম বুদ্ধি। সুতরাং সেখানে ক্ষমতার স্বৈরাচার। কোন ছেলে যদি ইতিহাসে পটু হয়, তাতে জোর ক'রে বলা যাবে না যে সে গণিত, রসায়ন বা সঙ্গীত-বিদ্যায় ওস্তাদ হবে। ধী-শক্তি এক বিষয়ে প্রখর হ'লে অন্য বিষয়েও তা প্রসারিত হয়, একথা থর্ণ্ডাইক্ স্বীকার করেন না। রস্ (Ross) সাহেব বলেন, "Knowledge is not something in the mind, but rather the mind itself. * * * Just as food does not remain something in the body, but becomes the body, so properly assimilated facts become the mind."† শরীরের ভিতরে খাদ্য-বস্তু খাদ্যরূপে থাকে না, জীর্ণ হয়ে রস-রক্ত হয়, তেমনি বহু বিষয় মনের পরিপাকশক্তিতে এক হয়ে 'মন' গড়ে ওঠে।

এই মনের সারভাগ Intelligence—বুদ্ধি, মেধা, ধীশক্তি। এ জিনিস ভগবানের দান। সব শিশুর, সব ছেলে-মেয়ের বুদ্ধি আছে ; কারুর কম, কারুর বেশী। কি একটি ছেলে বা মেয়ে, কি একসাথে অনেকটি, যখন লেখা-পড়া শিখ্‌তে যায় স্কুলে, তখন শিক্ষকের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন হয় তার বা তাদের বুদ্ধি-শক্তির পরিমাপ করার, আগে থেকে বুঝ্‌বার, যে ছেলেটি, কিংবা মেয়েটি, অথবা ছেলে-মেয়ের শ্রেণীটি কি প্রকার মানস উপাদানে গঠিত। ভবিষ্যৎ জীবনে কে কোন্ বিষয়ে বা কোন্ পথে তার স্বভাব-নির্দিষ্ট ধী-শক্তিকে চালিত কর্‌বে—তা কিছু

† Educational Psychology (Ross) P. 221.

পরিমাণে বুঝ্‌তে পারা যায়, যদি আগে থেকে তার একটা পরিমিতি সম্ভবপর হয়।

বিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স দেশের অধিবাসী মনোবিজ্ঞানবিদ্ আলফ্রেড্ বিনেট্ সর্বপ্রথমে বুদ্ধি-মাপের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন। প্যারি সহরের স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভাল ছেলে আর বোকা ছেলের পার্থক্য স্থির করার একটা কিছু প্রণালী আবিষ্কার করতে আদেশ করেন। কোন্ জাতীয় ছেলে সাধারণের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে বিশেষ শিক্ষার উপযোগী হ'তে পারে—এই ছিল তাঁর ওপর আরোপিত কার্যভার। বিনেট্ দেখেলেন—এই বিচার-ব্যাপারে একটা মাপ-কাঠি দরকার। পরীক্ষা-গ্রহণ তিনি কর্‌বেন, স্থির হ'ল। এক বারের পরীক্ষায় কুলোবে না, তা-ও বোঝা গেল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বুদ্ধিও বাড়্‌তে থাকে, প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন, সাইমন্ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি কতকগুলি প্রশ্নমূলক পরীক্ষা প্রবর্তন কর্‌লেন। বয়সের অনুপাতে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির কর্‌লেন। সাধারণ জ্ঞান কোন্ ছেলে বা মেয়ের কতখানি তারই পরীক্ষা। বহু শিশু, বালক ও বালিকার পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে সেই প্রশ্নগুলির ইতর বিশেষ কর্‌লেন এবং বয়স অনুযায়ী প্রশ্নের মাপ-কাঠি ঠিক কর্‌লেন। প্রশ্নগুলির পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের পর যে মাপ-কাঠি স্থির হ'লো, তার নাম হয়েছে "বিনেট্ সাইমন্ মাপকাঠি।" ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ সালে এই প্রণালীতে স্কুল-গামী ছাত্র-ছাত্রীগণের পঠন-যোগ্যতার পরিমাপ করা হয়। প্যারি সহরের বহু ছেলে-মেয়ে এইভাবে পরীক্ষিত হলো।

"বিনেট্‌-সাইমন" প্রণালীর অনুসরণ, এর পর, নানা দেশে হ'তে লাগ্‌লো। ইংলণ্ডে সিরিল্ বার্ট্ এবং মার্কিন-মুলুকে গডার্ড সাহেব বুদ্ধির ওজনে লেগে গেলেন। তাঁরা পূর্বোক্ত প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর্‌লেন। এর পর মার্কিন দেশের টার্‌ম্যান্ সাহেব আরও কিছু নূতনত্বের প্রয়োগ কর্‌লেন। তার নাম হ'ল "ষ্টান্‌-ফোর্ড"-এর সংশোধনী পরীক্ষা। তিনি ৩ বছর থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক পরীক্ষা করলেন ৬ প্রকারে; ১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের ৮ প্রকার, ১৪ বছরের ৬ প্রকার, প্রাপ্ত বয়স্কের ৬ প্রকার, পূর্ণ বয়স্কের ৬ প্রকার পরীক্ষা-প্রণালী অনুসৃত হ'ল। ১১ বছরের এবং ১৩ বছরের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া হ'ল না, কেননা যৌন-বৃত্তির উন্মেষ ঐ দুই সময়ে হয়।

এ তত্ত্বের অনেক খুঁটি-নাটি আছে। তাতে প্রবেশ কর্‌বার পূর্বে বালক-বালিকা এবং তরুণ-তরুণীদের বয়স নির্ধারণের রীতি আলোচনা করা দরকার। মনোবিজ্ঞানবিদ্ শিক্ষকগণ দু'রকমে বয়স গণনা করেন। একটা সত্যিকারের বয়স আর একটা মানস-শক্তি-উন্মেষের কল্পিত বয়স। 'কল্পিত' না ব'লে 'মানস' বলাই ভাল। ইংরেজী নাম যথাক্রমে, Chronological Age এবং Mental Age। সংক্ষিপ্ত ইংরেজী নাম C. A. এবং M. A.। একটি ছেলে বা মেয়ের 'প্রকৃত' বয়স যদি হয় ৯ বৎসর, তার 'মানস' বয়স—৯-এর কোঠায় না থেকে নীচে বা ওপরে যেতে পারে। বুদ্ধির 'মান' প্রয়োগ কর্‌লে হয়ত দেখা যাবে, তার মানস বয়স মাত্র ৬ বৎসর; অর্থাৎ তার বয়স অনুসারে বুদ্ধি প্রখর নয়। আবার, এর বিপরীতও হ'তে পারে। তার বয়স ৯ বৎসর, কিন্তু বুদ্ধি ১২ বছরের উপযোগী।

বিনেট্ বলেন, যদি পরীক্ষিত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৯০ পর্যন্ত একই মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লে বুঝ্তে হবে সেই বয়সের আনুপাতিক বুদ্ধির পরিমিতি নির্ভুল হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই 'মানস' বয়স নির্ধারণের পদ্ধতি আবিষ্কার শিক্ষাজগতের একটি অভিনব এবং প্রয়োজনীয় লাভ।

'মানস' বয়স ৭ বৎসর, অথচ প্রকৃত বয়স একটি ছেলের ৬ বৎসর, একটির ৭ বৎসর এবং আর একটির ৮ বৎসর,—এমন যদি হয়, তাহ'লে বোঝা যাবে, প্রথমটি খুব ভাল (bright), দ্বিতীয়টি মাঝারি অর্থাৎ সাধারণ (average), এবং তৃতীয়টি পশ্চাৎপদ (backward)। 'মানস' বয়স এই তিনটি ছেলের এক ; তাহ'লে এদের পার্থক্য কোথায় ? এদের বুদ্ধি-মানের তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য পাওয়া যাবে, যদি আমরা প্রতিটি ছেলের 'প্রকৃত' বয়সের সমানুপাত (Ratio) তার 'মানস' বয়সের সঙ্গে নির্ণয় করি। একে বলা যায় —বুদ্ধির আনুপাতিক ভাগফল (Intelligence Quotient)। ইংরেজিতে সঙ্কেতে বলা যায়—I. Q. 'মানস' বয়সকে 'প্রকৃত' বয়স দিয়ে ভাগ ক'রে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ কর্লে—যে-কোন ছেলে বা মেয়ের I. Q. বের হবে। যে ছেলের সত্যিকারের বয়স ৬, এবং 'মানস' বয়স ৯ বৎসর, তার I. Q. হবে ১৫০।

$$\frac{\overset{৩}{\cancel{৯}}}{\underset{২}{\cancel{৬}}} \times ১০০ = \frac{৩০০}{২} = ১৫০।$$

আবার

যে ছেলের 'মানস' বয়স ৯, এবং সত্যিকারের বয়স ১২ বৎসর, তার I. Q. হবে ৭৫।

$$\frac{\overset{৩}{\cancel{৯}}}{\underset{৪}{\cancel{১২}}} \times \overset{২৫}{\cancel{১০০}} = ৭৫।$$

আবার—

যে ছেলের 'প্রকৃত' বয়স তার 'মানস' বয়সের সমান, তার I. Q. হবে ১০০।

সুতরাং—

$$\frac{\text{C. A.}}{\text{M. A.}} \times ১০০ = \text{I. Q.}$$ (আনুপাতিক ভাগফল)।

টার্মান্ সাহেব একজন জার্মান্ পণ্ডিতের কাছ থেকে এই সূত্রের সন্ধান পান। তাঁর নাম ষ্টার্ন্ (Stern)।

কোন নির্দিষ্ট বয়সের ছেলেকে যদি ৬টি পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে যদি ২ মাস যোগ দেওয়া হয় এবং অনুত্তীর্ণ হ'লে ২ মাস বিয়োগ দেওয়া যায়, তাহ'লে 'মানস' বয়সের হিসাব অনেকটা নির্ভুল হয়। I. Q. বের করতে হ'লে সত্যিকারের বয়স ১৬ ধরা হয়। কোন যুবক বয়সে ১৬র বেশী হলেও, তার প্রকৃত বয়স ১৬ই ধরা হবে। কেননা বহু পরীক্ষার ফলে অবধারিত হয়েছে, ১৬ বছর বয়সের পর কোন ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না। এর তাৎপর্য এই, শিশু ও কিশোরের 'মানস' বয়সের মূল্য যত, প্রাপ্ত বয়স্কের 'মানস' বয়সের মূল্য তত নয়। একই 'মানস' বয়সের ছেলের বিভিন্ন I. Q. হ'তে পারে, আবার একই I. Q.র ছেলে বা মেয়ের প্রকৃত বয়স বিভিন্ন হ'তে পারে।

ষ্ট্যান্ফোর্ডের বয়ঃ-পরিমিতিতে দেখা গেছে—প্রতিটি পরীক্ষার উপযোগী বয়স ধরা হয়। ৩ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের

ধরা হয় প্রত্যেকের ২ মাস; ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৩ মাস; ১৪ বছরের ৪ মাস; প্রাপ্তবয়স্কের ৫ মাস এবং পূর্ণবয়স্কের ৬ মাস। একটি ১২ বছর ২ মাসের ছেলে যদি দশ বছর বয়সের উপযোগী সমস্ত পরীক্ষায়, ১২ বছর বয়সের উপযোগী ৫টি পরীক্ষায় এবং ১৪ বছর বয়সের উপযোগী ২টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে, তার "মানস" বয়স—১০ বছর +১৫ মাস +৮ মাস, অর্থাৎ ১১ বছর, ১১ মাস। গড়্‌পড়্‌তায়—প্রাপ্তবয়স্কের 'মানস' বয়স ১৬২ বছর এবং পূর্ণ-বয়স্কের ১৯২ বছর। নীচে কয়েকটি বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার উল্লেখ করা গেল।

(ক) বিনেট্-স্কেল

১। **তিন বছর** বয়সের শিশুদের জন্যে—

ক। নাক, চোখ, মুখ দেখানো।

খ। দুই সংখ্যার হিসাব, অর্থাৎ শতকিয়া বলা।

গ। কোন ছবি থেকে বিভিন্ন দ্রব্য গুণে দেখানো।

ঘ। নিজের উপাধি, ঘোষ, বোস্, চ্যাটার্জি ইত্যাদি বলা।

ঙ। কোন একটি ছোট বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা।

২। **পাঁচ বছর** বয়সের শিশুদের জন্যে—

ক। দু'টি ওজনের শিলের তুলনা করা।

খ। কোন একটি ত্রিভুজ বা সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রের অঙ্কন—আদর্শ দেখে।

গ। ছোট আয়তনের বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা।

ঘ। দু'টি ত্রিভুজ থেকে একটি ত্রিভুজ আঁকা।

ঙ। চারটি মুদ্রার গণনা।

৩। **আট-বছর** বয়সের ছেলে বা মেয়ের জন্যে—

ক। কোন ছবি থেকে বাদ-দেওয়া অংশের উল্লেখ করা।

খ। ২০ থেকে ১—উল্টো দিকে বলা।

গ। স্মরণ ক'রে কোন জিনিসের পার্থক্য দেখানো।

ঘ। পাঁচ-অঙ্কের সংখ্যা বলা।

ঙ তারিখ, মাস এবং সাল বল্‌তে পারা।

খ। টারম্যানের ষ্ট্যানফোর্ড স্কেল

১। **তিন বছর** বয়সের শিশুদের জন্যে—

ক। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখানো।

খ। পরিচিত বস্তুর নাম করা।

গ। ছবিতে আঁকা জিনিসের নাম করা এবং সংখ্যা বলা।

ঘ। ৬ বা ৭ শব্দাংশ-সম্বলিত ইংরেজি কথার পুনরাবৃত্তি করা।

ঙ। নিজ পরিবার বা গোষ্ঠীর নাম করা।

চ। নিজে ছেলে না মেয়ে সে কথা বলা।

২। **পাঁচ-বছর** বয়সের শিশুদের জন্যে—

ক। ওজনের শিল মেপে বলা।

খ। রং-এর নাম করা।

গ। কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা কম বা বেশী, তবা লা।

ঘ। উপযোগিতা বা ব্যবহার অনুসারে কোন জিনিসের সংজ্ঞা নির্ণয় করা।

ঙ। ২টি ত্রিভুজ এক সাথে ক'রে একটি আয়তক্ষেত্রে বানানো।

চ। তিনটি হুকুম চট্‌পট তামিল করা ; যেমন,—
টেবিলে চাবি রাখা, দরজা বন্ধ করা

আর একখানা বই নিয়ে আসা।

৩। **আট বছর** বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্যে—

ক। মাঠ ও বল্ নিয়ে পরীক্ষা।

খ। ২০ থেকে ১ উল্টো গণা।

গ। বিচার-বোধের পরিমাপ—যেমন,
"তোমার কোন খেলার সাথী যদি ইচ্ছে না ক'রে হঠাৎ আঘাত দেয়, তাহ'লে তুমি কি করবে?"

ঘ। বস্তুর তুলনা-বোধ (সমতা, অসমতা নয়)।

ঙ। অপ্রচলিত বা অব্যবহৃত দ্রব্যের সংজ্ঞা-নির্ণয়।

চ। শব্দ-জ্ঞান, অন্ততঃ কুড়িটি শব্দ জানা।

১৯১৬ সালে টার্ম্যানের 'স্কেল্' প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৩৬ সালে তিনি আর একজন শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে মিলিত হয়ে—একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

মানুষের বুদ্ধির I. Q. টারম্যান (Terman) ফেলেছেন নিম্নরূপ।—

১৪০ ও তদূর্ধ্ব — অসাধারণ প্রতিভাবান্।
১২০ — ১৪০ — প্রতিভাবান্।
১১০ — ১২০ — সাধারণের কোঠার উর্ধ্বে।
৯০ — ১১০ — সাধারণ।
৮০ — ৯০ — অল্প-বুদ্ধি।
৭০ — ৮০ — বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন।
৭০ এর নীচে — একেবারে বুদ্ধিহীন।
৫০—৭০ — বুদ্ধিহীনের (একটু উঁচু স্তরের)।

২৫—৫০ — একেবারে বুদ্ধিহীন

২৫শের নীচে— প্রায় পাগলের পর্যায়ে।

এই পরীক্ষিত তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ৯০—১১০ সাধারণ বা গড়্-পড়্তা মানব-মানবীর I. Q.। শতকরা প্রায় ১৪ জন অসাধারণ বুদ্ধিমানের কোঠায়, আবার বুদ্ধিহীনের কোঠায় সম-পরিমাণ I. Q.—অর্থাৎ ৮০—৯০। একদিকে ১২০—১৪০, আর ঠিক বিপরীত দিকে ৭০—৮০। মোটের উপর দেখা যায়, প্রকৃতি-দেবী বুদ্ধির পরিবেশনে সমতা রক্ষা করেন।

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে একটা আপত্তি শোনা যায়। অনেকে বলেছেন, ও পরীক্ষাগুলি শিক্ষিত বাড়ীঘর বাসী ভদ্রলোকদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে। ও পরীক্ষাগুলি অনেকটা ভাষা-জ্ঞান ও ভাষাশিক্ষার পরিমাপক। সেই জন্যে মার্কিন দেশের আর একজন শিক্ষাব্রতী অশিক্ষিতদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন। ও 'B' Test অর্থাৎ 'খ'-শ্রেণীর লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট।

এখন, পরীক্ষা যে-শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্যেই নির্দিষ্ট হোক্ না কেন, যদি বোঝা যায়, কোন বালক বা বালিকার বুদ্ধির দৌড় একটা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম কর্‌বে না, তাহ'লে প্রশ্ন হ'তে পারে, তাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে বিশেষ কি ফল-লাভ হবে। কাউকে যদি বলা যায়—জন্ম থেকে নিরেট্ বোকা, তাহ'লে ভদ্রতার ত্রুটি হ'তে পারে, কিন্তু সত্যের অপলাপ হয় না। কোন এক ব্যক্তির I. Q. আগা-গোড়া প্রায় একই রকম থাকে; বয়স বাড়্‌লে বাড়ে না। এড্যাম্‌স্ সাহেব একটি ৬ বছর ৫ মাসের ছেলের পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, তার 'মানস' বয়স ১১ বছর ৭ মাস। তার I. Q. ছিল

১৮০'৫। এক বছর পরে তাকে আবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, তার I. Q.— ১৮২। এ একটি অনন্যসাধারণ ব্যাপার। সাধারণতঃ দেখা যায়, I. Q. বাড়ে না। অবশ্য পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা অনেকে করেছেন, এবং করা উচিতও শিক্ষকের পক্ষে। বারংবার গৃহীত পরীক্ষার ফলাফলের সমতা (correlation) অনেক স্থলেই '৯ হ'তে দেখা গেছে। এই সমতার যেখানে বৈলক্ষণ্য দেখা গেছে, সেখানে পরীক্ষা-গ্রহণের মধ্যেই কোন ত্রুটি হয়েছে, সিদ্ধান্ত করতে হবে।

সাধারণ অবস্থায় কারুর 'মানস' বয়স ১৬ বছরের পর বাড়ে না। পূর্ণবয়স্কেরা হয়ত বিশ্বাসই করবে না যে, যখন তাদের বয়স ১৬ বৎসর ছিল, তখনকার চেয়ে বুদ্ধি বাড়ে নি। কথা শু'নে হয়ত তারা হাসবে। ব্যালার্ড্ সাহেব এক নূতন ধরণের বুদ্ধি-পরিমিতির প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন—এই মনে ক'রে যে বয়স বাড়্লে, আর কিছু না হোক্, যুক্তিপরায়ণতা বাড়ে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেরা যত ওপরের শ্রেণীতে উন্নীত হয়, ততই কমবুদ্ধির ছেলেরা ঝ'রে পড়ে যায়। সুতরাং নানা বিরুদ্ধ মতবাদ সত্ত্বেও উক্ত শিক্ষারথী প্রায় ২০০০ ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা গ্রহণ ক'রেছেন। তাদের বয়সের ধাপ ছিল—১১ থেকে ১৮। তিনি দেখেছেন, কোন একটি নারীদের ট্রেনিং কলেজের পূর্ণবয়স্কেরা একটি মাধ্যমিক স্কুলের ১৬ বছরের মেয়েদের চাইতে বেশী সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। আবার, স্কুলের মেয়েদেরও—১৫ বছরের যারা, তারা হয়ত সামান্য কিছু উন্নতির পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু ১৬ বছরের বেশী বয়সের যারা, তারা কোন উন্নতির পরিচয় দেয় নি।

ব্যালার্ড্ সাহেব নিম্নলিখিত তালিকাটি গেঁথেছেন। *

বয়স	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তীর্ণের মান	১৩.১	১৪.৪	১৫.১	১৭.৪	১৮.৫	১৮.৯	১৮.৯

এই তালিকায় দেখা যায়, ১৭ বছরে কোন উন্নতি নেই। পুরুষ আর মেয়েতে খুব তফাৎ দেখা যায় না। তবে পুরুষের বুদ্ধির তারতম্যের মাত্রা বেশী। অত্যন্ত উঁচু 1. Q. পাওয়া যায় পুরুষদের মধ্যে। আবার নিতান্ত গোবেট্ বা নিরেট্ গোবরগণেশের সংখ্যা মেয়েদের চাইতে পুরুষের বেশী।

অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্ বহু পরীক্ষার পর এক একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। একটি বুদ্ধি-পরিমাপের দ্বি-শক্তি তত্ত্ব (Two-factor theory)। তিনি বলেন, প্রতি মানুষের মানস-শক্তির দু'রকম উপাদান—সাধারণ ও বিশেষ। যে-কোন শিশু, বালক, বালিকা, তরুণ ও তরুণীর স্বভাবজ এবং আবেষ্টন-গত বুদ্ধির পরিচায়ক একটি সাধারণ ধর্ম আছে, যার পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বিশেষ ধর্মগুলি—পরিবর্তন-সাপেক্ষ। সঙ্গীতে দক্ষতা, গণিতে তৎপরতা কিংবা কথার প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য—এগুলি বিশেষ শক্তি। একই ব্যক্তিতে এই গুণগুলির তারতম্য এবং পরিবর্তন সম্ভবপর। একই ব্যক্তির বিভিন্ন বুদ্ধি-পরিচায়ক কাজ, কর্ম ও জ্ঞান পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত, কেননা সেই কাজ, কর্ম ও জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম একই। আবার, এক এক ধরণের কাজের এক একটি বিশেষ

* Ross—"Educational Psychology" P. 232.

ধর্ম আছে। স্পীয়ারম্যান্ একটিকে বলেছেন 'g' factor, আর একটিকে নাম দিয়েছেন "s" factor। সুতরাং কোন এক ব্যক্তিতে 's' অনেক, 'g' মাত্র একটি। সুতরাং কোন ব্যক্তির বুদ্ধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ-মানের ২টি অংশ। একটি সাধারণ শক্তির মাত্রানুগত, আর একটি সেই পরীক্ষিত বিষয়ে তার বিশেষ শক্তির মাত্রানুগত। এই সত্যটিকে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্ বীজগণিতের সমীকরণ পদ্ধতিতে একটি অঙ্কে ফেলেছেন।

এখানে a, b, p, ও q এক ব্যক্তির চারটি ক্ষমতার দ্যোতক। ${}^{r}ap$, ${}^{r}bq$, ${}^{r}aq$, ${}^{r}bp$—ক্ষমতাগুলির সম্পর্ক-দ্যোতক। ফরমূলাটি এই— ${}^{r}ap \times {}^{r}bq - {}^{r}aq \times {}^{r}bp = 0$

রস্ (Ross) সাহেবের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তিনি লিখেছেন,—

"There are certain broad, well-established results of mental testing. Of these perhaps the most general is that there is some *intellective quality* which can be tested, although it is not certain that this is identical with what the ordinary man calls intelligence."

আমরা পরীক্ষা করতে পারি intellective qualityর, কেননা intelligence কথাটি আরও ব্যাপক। কিন্তু যেমন পরীক্ষাই করি না কেন, কোন শিশু, বালক বা তরুণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ নির্দেশ বা নিশ্চিত অনুমান করা কি সম্ভব? এই রকমের পরীক্ষাতে চরিত্রের বা নীতি-বোধের পরীক্ষা হয় না। তথাপি

সমাজের কল্যাণ-কল্পে বিশেষজ্ঞগণ এই মনঃ-পরীক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা ও পরিশ্রম করেছেন এবং এখনও কচ্ছেন।

এই সব পরীক্ষার এক ধাপ উঁচুতে আর এক রকমের পরীক্ষা আছে। সিভিল্‌-সার্ভিস্‌, সামরিক চাকুরী, ট্রেনিং-কলেজের প্রবেশ-পরীক্ষা উঁচুদরের জিনিস। প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন বাংলায় জামাই-ঠকানো প্রশ্ন ছাড়া পণ্ডিত-সমাজে নানা রকমের প্রশ্নোত্তরের কস্‌রত চল্‌তো। সমাজ-জীবনে বুদ্ধিজীবীর আদর সেকালেও ছিল, এ কালেও আছে। শিক্ষা-ব্যবসায়ীর পক্ষে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা ক'রে প্রশ্ন-পঞ্জী গঠন করা প্রয়োজন। দেশের নূতন পরিস্থিতি এবং পরিবেশের উপযোগী প্রশ্ন-পঞ্জী নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ব্যতিরেকেও সর্বসাধারণের আগ্রহ আবশ্যক।

মনঃ-সংযোগ

শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এমন দেখা যায় প্রায়ই যে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশন কচ্ছেন নিখুঁত-ভাবে, অথচ বিদ্যার্থীর শ্রেণীতে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে না, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছেলেদের সহযোগিতা এবং সক্রিয় মনোযোগের ওপর নির্ভর ক'রে যদি শিক্ষক তাঁর পরিকল্পিত পাঠ-স্যূচীর কিয়দংশ মাত্র অগ্রসর হন, তাও ভাল। কিন্তু শিক্ষক সৌষ্ঠব, সুরুচি, যোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত ক'রে যদি দেখেন ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কোন স্থায়ী দাগ বস্‌লো না, তাহ'লে তাঁর পরিশ্রম বিফল হ'ল, বল্‌তে হবে। সুতরাং ছাত্রের বা ছাত্রীর মনোযোগ যে কৌশলেই হোক্ আকর্ষণ কর্‌তে হবে।

"মনোযোগ" কথাটির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। ও-জিনিসটি কোন একটি আশ্রয়কে ভিত্তি ক'রে রূপ নেয়, নিরাশ্রয় অথবা বিষয়-ব্যতিরিক্ত নয়। আরও সরল কথায় বলা যেতে পারে, কোন ব্যক্তি বিষয়-বিশেষে মনঃ-সংযোগ করে। ব্যক্তির এখানে প্রাধান্য।

কোন বড় এক ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখ্‌লে আলোর নিকটবর্তী জিনিষগুলি স্পষ্ট দেখা যায়; দূরের গুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট দেখা যায়। চোখের দৃষ্টি কোন বস্তুতে নিবদ্ধ কর্‌লে স্পষ্টরূপ দৃষ্টিপথে পড়ে। দূরের বস্তুতে দৃষ্টি ক্রমশঃ তির্য্যক্ বা বাঁকা হয়। আলোক-

চিত্রের ক্যামেরার সাহায্যেও তাই দেখি। মনের ক্ষেত্রেও এক কথা। যে ব্যাপারে মনঃ-সংযোগ করা হয়, তার ধারণা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়। যাতে মনের স্বল্প-সংযোগ, তার ধারণাও কম স্পষ্ট। আর যে বস্তুগুলি প্রস্তুত মনের সীমানার প্রান্তভাগে আছে, তাদের ধারণাও প্রান্তীয়। রস্ সাহেব আর একটি উপমার উল্লেখ ক'রেছেন। ধ্যেয় বস্তুকে যদি অনুভূতি-স্রোতের মধ্যগত একটি জিনিস মনে করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে, যেখানে স্রোতাবেগ মন্দীভূত হ'য়ে স্থিরপ্রায় হয়েছে, সেখানেই ধ্যেয় বস্তুটির স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং মনোযোগ শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রাকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে।

আর একজন মনীষী বলেন, 'মনোযোগ' স্বরূপতঃ একটি চলমান অবস্থা। এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে এর গতি। এমন কি, একই বিষয়ে কিছু বেশী সময় মনঃ-সন্নিবেশ করলে দেখা যাবে, মন মিনিটে মিনিটে বিষয়টির বিভিন্ন দিক্‌কে আয়ত্ত করছে। বস্তু-মাত্রেরই জ্ঞান মনোযোগ-ক্ষেত্রের প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে ধাবমান হচ্ছে। আমাদের সমগ্র চেতনা-রাজ্য থেকে মনঃ-সংযোগের বিষয়গুলি তাড়া দেয়। এ যেন একটি বৃহৎ প্রাসাদের ওপরের গম্বুজ; মনঃ-সমাবিষ্ট বিষয়গুলি যেন আছে ঐ গম্বুজে, আর তার বাইরের বিষয়গুলি প'ড়ে আছে প্রাসাদের নিম্নভাগে। গম্বুজের জিনিসে যেন আলোর ফোকাস্ পড়ে আর তার নীচে ও চারপাশে অন্ধকার।

উক্ত মনীষী আরও বলেন, সচেতন জীবের মনের তিনটি অবস্থাই 'মনঃ-সংযোগে'র মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞান, অনুভূতি এবং ইচ্ছা—এই তিনের ক্রিয়ার ঐক্য মনোযোগের মধ্যে আছে। সহজ কথায়

বোঝা যায়, কোন ব্যাপারে মনোযোগ দিলে প্রথমে তার জ্ঞান জন্মে, পরে ও-জিনিস লাভ করার জন্যে চেষ্টা আসে, তার পর আসে ইচ্ছা ও আগ্রহ। কেননা সযত্ন উদ্যমের ফলে কোন দুরূহ বিষয় আয়ত্ত হ'লে—তাতে এক বিশেষ রকমের প্রীতি ও নিষ্ঠার সৃষ্টি হয়। একে ইংরেজিতে বলে interest।

তৃতীয়তঃ, মনোযোগ ব্যাপারটাই নির্বাচনের ব্যাপার। মন এক বস্তু ছেড়ে আর এক বস্তুতে—অথবা একই বস্তুর সিঁড়িতে আরোহ কিংবা অবরোহ প্রথায় চলাচল করে। একটি না ছাড়্লে আর একটি ধরা যায় না। একই সময়ে এবং এক বারের চেষ্টায় একের অধিক বস্তুতে মনঃ-সংযোগ করা চলে না। সুতরাং নির্বাচন-ধর্ম মনোযোগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

আরও কয়েকটি লক্ষণ সংক্ষেপে আলোচ্য। 'মনোযোগ' জিনিসটি একটি প্রস্তুতি, খেলার মাঠে, দৌড়ের আগে, বাঁশীতে ফুঁ দেওয়ার মত। মনোযোগে যোগ্যতা বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মনোযোগ ইন্দ্রিয়বোধের জাগরণের সহায়ক। মনোযোগ দিলেই বিষয়-বিশেষে ইন্দ্রিয়ের সজাগ ও সতর্ক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তৃতীয়তঃ, কলা-কৌশল অভ্যাস কর্তে মনোযোগ ছাড়া হয় না। টাইপ করা, সাইকেল চড়া, টেনিস্ খেলা—সব রকম কৌশলের কাজে প্রথমে চাই তীব্র মনঃ-সংযোজন। স্মৃতি-শক্তির বর্ধনে মনঃ-সংযোগ একমাত্র চিরপ্রচলিত উপায়।

যে অবস্থাগুলি থাক্লে মনোযোগ আসে অর্থাৎ মনঃসংযোগের মূলীভূত কারণগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন। যে সকল বিষয় প্রথমে চেতনারাজ্য না হলেও মনের সক্রিয়তার আড়ালে ছিল, সে

সকল বিষয় দু'রকমের। কতক নির্ভর করে মনোযোগের বিষয়ের ওপুর, কতক নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর। কতক বিষয়-সাপেক্ষ, কতক ব্যক্তি-সাপেক্ষ।

বিষয়-সাপেক্ষ কারণগুলির প্রথমে ধরা উচিত মনোযোগ-আকর্ষণের উত্তেজক পদার্থের উগ্রতা বা মাত্রাধিক্য। গুঞ্জন-ধ্বনি আমরা বড় শুন্‌তে চাই না, কিন্তু হঠাৎ উচ্চ শব্দে কাণ খাড়া করি। রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ড বাজ্‌তে বাজ্‌তে যখন চলে, তখন মন সেদিকে যাবেই।

বৃহৎ আয়তন মনোযোগ আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ। রাস্তা দিয়ে যখন চলি, তখন ছোট ছোট বাড়ীঘরগুলি দেখেও দেখি না, কিন্তু বড় এবং জাঁকালো একটা বাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র মন আকৃষ্ট হয়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে বড় বড় হরফ্ দেওয়া হয় রকমারি ক'রে—শুধু মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে।

তৃতীয় কারণ—হঠাৎ পরিবর্তন। ক্লক্-ঘড়িটা যতক্ষণ টক্ টক্ করে, ততক্ষণ সেদিকে মন যায় না ; কিন্তু থেমে গেলেই নজর পড়ে।

মনঃ-সংযোগের চতুর্থ কারণ পৌনঃপুন্য, অর্থাৎ একই বস্তুর পুনঃ পুনঃ সংঘটন। যে-কোন বস্তু বার বার মনের দুয়ারে আঘাত কর্‌লে মন তাতে না লেগেই পারে না।

মনঃ-সংযোগের আর একটি কারণ ধ্যেয় বস্তুর অভিনবত্ব। যা চোখের ওপর ঘট্‌ছে, তা থেকে অন্য রকম কিছু হ'লেই মনোযোগ আসা স্বাভাবিক। ঘরের পরিচিত আস্‌বাব, চেনা-শোনা নিত্য-দেখা লোকজন মনকে সজাগ ও সক্রিয় করে না। নূতন কিছু জিনিস কিংবা নূতন-দেখা মুখ আমাদের মনকে সবলে আকর্ষণ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মনোযোগের অন্য কারণ, ব্যক্তিগত। সব জিনিস সব লোকের মনকে নাড়া দেয় না। যে জিনিসে আগ্রহ বা রস-বোধ বা স্বার্থ (interest) নেই, সে জিনিসে মন বসে না। ইংরেজি 'interest' কথাটির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ—"যাতে প্রয়োজন বা স্বার্থ আছে।" যার ফটো-তোলায় আনন্দ বোধ হয়, বল্‌তে হবে, আলোকচিত্রে তার আগ্রহ (interest) আছে। 'ফটো'—জিনিসটিই তার চিত্তকে রঞ্জিত করে। এই আগ্রহ বিষয়-গত। আবার, যখন কেউ ফটো-তোলার কাজে মগ্ন হ'য়ে আছে, তখনও আমরা বলি, এতে তার রস-বোধ (interest) আছে। সুতরাং রস-বোধ ব্যক্তিগত। জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে কোন লোকের (শিশু বা তরুণের) বিষয়-বিশেষে রস-বোধের নিবিড় সম্পর্ক আছে। মুরগী-ছানার ঠোকর মার্‌তে ভাল লাগে, বোল্‌তার কাদা-ঘর বানাতে ভাল লাগে, ছেলে-মেয়েদের খেলা-ধূলায় মজা লাগে, শিশুদের চক্‌-মকে জিনিস খুব ভাল বোধ হয়। শিক্ষক শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তির অনুগত এই রস-বোধকে নানা কৌশলে জাগাবেন। শিশু শিক্ষা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে রসানুভূতি লাভ করবে। শিশু রসানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার সার-ভাগ অধিগত কর্‌বে।

জন্মগত প্রবৃত্তি ছাড়াও মনোযোগ আস্‌তে দেখা যায়। সে হচ্ছে আবেষ্টন, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা-জাত অভ্যাস। এই মনোযোগের প্রকার-ভেদ আছে। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্‌। কোন গ্রন্থাগারে একই সঙ্গে উপস্থিত একজন অধ্যাপক, এক মিষ্টিওয়ালা, একজন পুস্তক-বিক্রেতা এবং একটি শিশু। সেখানে বইগুলিতে কার কি ভাবে মন যাবে? আমরা দেখি, অধ্যাপক বই ঘাঁট্‌বেন অধ্যয়ন

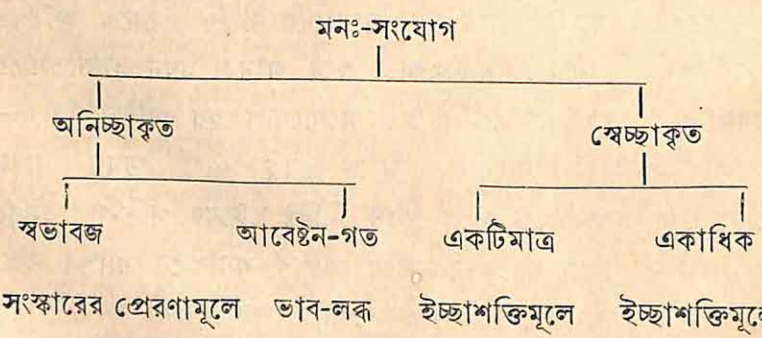
ও গবেষণার জন্যে, মিষ্টিওয়ালা খোঁজ করবে কাগজের মোড়ক, পুস্তক-বিক্রেতা করবেন লাভ-লোক্সানের খতিয়ান—আর শিশু অনুসন্ধান করবে কোন্ কোন্ বইতে রং-বেরং-এর ছবি আছে, কোন্ বইখানার মলাট ছবিতে ভরা আর তা কেমন ছবি, কি ছবি ইত্যাদি।

আর একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। পথিক চল্ছে পথ দিয়ে ; দরজী দেখ্ছে তার পোষাক, নর-সুন্দর দেখ্ছে তার চুলের বাহার, মুচি দেখ্ছে তার জুতো। পকেট্-মার শ্যেনদৃষ্টি হান্ছে তার পকেটের দিকে, ভাব্ছে দাঁও পেলেই হয়। আবার, মন যখন খুসী থাকে, তখন বন্ধুর গুণগুলি মনে ছাপ মারে ; মন যখন ভারী, তখন বন্ধুর দোষগুলি খুঁটে খুঁটে দেখি। সুতরাং শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল আমাদের মনং-সংযোগ ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে।

মনোযোগ দ্বিবিধ, স্বেচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাগত। অনিচ্ছাগত মনোযোগ আসে বাইরে থেকে, তাতে নিজের মনের স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রসারণ নেই। কোন বক্তা যখন বাগ্মিতার চাতুর্যে আমাদেরকে মুগ্ধ করেন, কোন উপাখ্যান যদি আমাদের সমগ্র সত্তাকে অধিগত করে, অথবা বাইরে কোন চীৎকার শুনে' আমরা যখন অজ্ঞাতসারে দরজা বা জানালা খুলে ফেলি, তখন মনোযোগ হয় অনিচ্ছাগত।—আর স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগে আছে প্রযত্ন এবং উদ্যম। যখন রেলপথের সময়-নির্ঘণ্ট থেকে কোন নির্দিষ্ট ট্রেনের গতি-পথ নির্ণয় করি, যখন গণিতের কোন জটিল প্রশ্নের সমাধানে ব্যাপৃত হই, যখন কোন 'বিল্' ঘেঁটে পাওনা-দেনার পর্যালোচনা করি, যখন ছেলেরা কোন সুকঠিন পাঠে নিরত হয়, তখন মনঃ-সংযোগ হয় স্বেচ্ছাকৃত।

স্কুলের শিক্ষার্থীর পক্ষে মনোযোগ প্রথমে থাকে স্বেচ্ছাকৃত (voluntary)। শিক্ষক নানা উপায়ে—নানা প্রহরণে তার মনকে জয় করেন ; পরে তা হয় অনিচ্ছাকৃত (involuntary) ; তখন তার মন আপনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ে আবৃত্ত হয়। শিক্ষা তখনই হয় সার্থক—যখন শিক্ষক শিশু-মনকে অন্ধকারের কুহেলি থেকে আলোকের ঝলকে পৌঁছিয়ে দেন, যখন শিশুর স্বভাব-জাত এবং অভ্যাস-গত স্বার্থবোধ নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত হয়, যখন অনিচ্ছার বাঁধ ভেঙ্গে শিক্ষক তার মনকে উদ্বেল ক'রে দেন।

রস্ সাহেব স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগকে দুই রকমে ভাগ ক'রেছেন। যে ক্ষেত্রে একটিমাত্র ইচ্ছাশক্তি কোন কাজকে বা অনেকগুলি ধারাবাহিক কাজকে প্রণোদিত করে, সেখানে মনঃ-সংযোগ এক রকমের। আবার যে কাজে বা যে ধারাবাহিক কার্যাবলীতে নব নব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে মনঃসংযোগ রক্ষিত হয়, সে আর এক রকমের। রস্ সাহেবের অঙ্কিত একটি ছক্ নীচে দেওয়া গেল।



এখন মনঃ-সংযোগের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বিশদ আলোচনা করা আবশ্যক। ছাত্র বা ছাত্রীর

মনোযোগ আদায় করা শিক্ষকের বড় কাজ, কিন্তু সম্প্রতি একটি কথা উঠেছে, শিশুর (বিদ্যার্থীর) চিত্তরঞ্জন করতে হবে। প্রাচীনপন্থীরা বলেন, অতিরিক্ত চিত্তরঞ্জনের ফলে ছেলেমেয়েদের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়, তাদের নৈতিক দৃঢ়তার ব্যত্যয় হয়। কিন্তু এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, মনঃ-সংযোগের প্রতি ব্যাপারে চিত্তাকর্ষক উপাদান কিছু না কিছু আছে। পূর্বে যাকে আমরা ব'লেছি interest (স্বার্থবোধ)—সে, হচ্ছে একটি কর্ম-ধর্মী মানস প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মূলে থাক্‌তে পারে স্বভাবজ সংস্কার, উদগ্র মনোভাব—এমন কি কোন শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তা। যেখানে সত্তার প্রশ্ন, সেখানে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব। স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগ সেইজন্যেই শিক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারে বিশেষ মূল্যবান্। শিক্ষকের পক্ষে যে-জিনিসটি বিরক্তিকর, অথচ যা দিয়ে তাঁর যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার হবে, সে হচ্ছে ছেলেদের মনোযোগ আদায়। ছেলেকে সম্‌ঝাতে হবে যে, যা তার আজ ভাল লাগ্‌ছে না, কাল তা ভাল লাগ্‌বেই। যতই শিশু নানা জিনিস শিখ্‌তে থাকবে, ততই তার মনোযোগের প্রকৃতি বদ্‌লে যাবে ; প্রথমে যে বিষয়ে নানা রং-চং, নানা ফন্দী-ফিকির দরকার হ'তো মনোযোগ আনার উপায়স্বরূপে, বড় হলে ছেলের তা প্রয়োজন হয় না ; তখন তার মনঃ-সংযোগ সুসংস্কৃত ধারায় চলে। নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী বা টেবিল্‌-থাব্‌ড়ানি বড় ছেলেদের জন্যে দরকার হয় না। গণিতের শিক্ষক ছেলেকে বোঝাবেন যে, আঁক্ কষা একটা চাপ বা একটা ভার-বোঝা নয়, ওতে সে পাবে এক নিরাবিল আনন্দ। তখন সে আর শুধু তোতাপাখী হবে না বা শুধু পরীক্ষা পাশকেই একমাত্র লক্ষ্য ব'লে মনে করবে না। সুতরাং

মস্তিষ্কের রাজ্যে (অর্থাৎ শিক্ষালয়ে) স্বতঃস্ফূর্ত, অনিচ্ছাকৃত মনঃ-সংযোগের মূল্য বেশী। ছাত্রের মনে জন্মাবে গণিতে অনুরাগ (sentiment) ; তখন ছেলে নিজের শিক্ষার পথ নিজেই আবিষ্কার ক'রে ক'রে চল্‌বে। শিক্ষক হবেন শুধু পরিচালক—পথপ্রদর্শক।

নূতন যুগের শিক্ষানায়কেরা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক গবেষণার পর মনঃ-সংযোগ সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থির ক'রেছেন। অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্‌ বলেন, শিক্ষা-গ্রহণে উন্মুখ প্রতিটি মন কোন নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ে যত রকমের প্রযত্ন বা অনুশীলন করে, তার সমষ্টির পরিমাণ একই রকম থাকে, প্রণালী যত রকমেরই হোক্‌ না কেন।* এর অর্থ, কোন ব্যক্তির মানস শক্তি-সম্পৎ সীমাবদ্ধ ; এই শক্তি একদিকে পরিচালিত হ'লে অন্য দিকে পরিচালিত হয় না। এর নাম দিয়েছেন তিনি 'law of span' (মনোযোগের মাত্রা-নীতি)।

পরীক্ষকরা tachistoscope নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিশক্তির (ও তৎসহ স্মৃতি ও তৎপরতার) পরীক্ষা ক'রেছেন। কোন ব্যক্তির সাম্‌নে ধরা হয়, খুব অল্প সময়ের জন্যে কতকগুলি ফোঁটা কিংবা কতকগুলি হরফ। তাকে প্রশ্ন করা হয়, সে কতগুলি দেখ্‌ল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, পূর্ণবয়স্কেরা এক নজরে ৫।৬টি মাত্র কালির ফোঁটা বা অক্ষর দেখে চিন্‌তে ও বল্‌তে পারে, যদি ফোঁটা বা অক্ষরগুলি এলোমেলোভাবে থাকে। কিন্তু

* Every mind tends to keep its total simultaneous cognitive output constant in quantity, however varying in quality.
Quoted from Ross's "Educational Psychology." Pp. 177-78

যদি সেগুলো সাজানো থাকে—ছোট, বড় কিংবা প্যাটার্ণ বা নমুনা হিসেবে, তাহ'লে পরীক্ষার্থী যুবক অধিকসংখ্যক ফোঁটা বা হরফ দেখ্‌তে ও মনে রাখ্‌তে পারে—একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপে। সাজানো থাক্‌লে যুবক প্যাটার্ণ দেখে আগে, পরে সংখ্যা গুণতে চেষ্টা করে। এ জিনিষটি মনের ধর্ম। মন প্রথমে গ্রহণ করে সমষ্টি, পরে বিচার করে খুঁটি-নাটি। ক্ষণকালদৃষ্ট ফোঁটাগুলির একটি আব্‌ছায়া বা প্রতিবিম্ব পড়ে যুবকের মনের ওপরে। এই প্রতিবিম্ব তার স্মরণলব্ধ বস্তু। যাদের এই স্মৃতি-চিত্র বেশী প্রশস্ত ও স্থায়ী, তাদের মনোযোগের মাত্রা (span of attention) বেশী। শ্রবণ-শক্তিরও এইভাবে অনেক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। মনঃ-সংযোগ কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তারও পরীক্ষা কম হয় নি। দেখা গেছে, প্রতি ৫।৬ সেকেণ্ড্ পর পর মনোযোগের শিথিলতা আসে, যদিও দেখা যায় অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন বিষয় নিয়ে কাটায়।

আর একটি জিনিসেরও পরীক্ষা হয়েছে। দুটি পৃথক্ কাজ একবারে কাউকে কর্‌তে বল্‌লে, কতখানি কাজ সত্যি হয়, তার পরিমাপক পরীক্ষা করা সম্ভবপর। ধরা যাক্, কোন লোককে এক রাশ তাস সাজাতে দেওয়া হয়েছে—ইস্কাপন্, রুহিতন এই ভাবে; সেই সঙ্গে তাকে গুণ্‌তে বলা হয়েছে—২৯, ৩৩, ৩৭...এইভাবে। দু' রকমের কাজে পৃথক্ নম্বর দেওয়া হয় যোগ্যতার পরিমাপক। আবার, দুই কাজে মিলে কতখানি এগোয়, তার জন্যও পাশ-ফেলের নম্বর দেওয়া হয়। দুই কাজ এক সঙ্গে ভাল এগোয় না, এটা পরীক্ষিত সত্য। এখানে মানস-শক্তি (মনোযোগ) দুই পৃথক্ ধারায় চলমান হয়; তাই কোনটি সুসম্পন্ন হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত

হয়েছে, মনঃ-সংযোগ কখনো তাস সাজানোর দিকে, কখনো গণনার দিকে যায়। খুব সামান্য কাল হয়ত মন একদিকে ঝুঁকে পড়ে, পরক্ষণে অন্যদিকে যায়। দুই পথে যুগপৎ চল্‌তে পারে না।

সব শেষে, চিত্ত-বিক্ষেপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা কর্‌বার মত। ভ্রম বা বিস্মৃতির নাম চিত্তবিক্ষেপ (distraction)। ভ্রম তো আমাদের পদে পদে। অনেক সময়ে দেখা গেছে, আমি হয়ত সেল্‌ফ্‌ থেকে একখানা বই টেনে নেব ব'লে চেয়ার থেকে উঠে' দাঁড়িয়েছি। মন বিষয়ান্তরে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে, দাঁড়িয়েই ভুলে গেছি—কি জন্যে দাঁড়িয়েছি। তখন হয়ত আবার চেয়ারে ব'সে ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিষয়টি আবিষ্কার করি। মনোযোগের বাধা জন্মিলেই distraction।

হৈ-চৈ, হট্টগোল সাধারণতঃ মনোযোগ নষ্ট করে। অনেকের আবার নিঝুম নিস্তব্ধতায় মন আসে না। অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা পড়্‌লে, আলোর অসুবিধা ঘট্‌লে, বসা-শোওয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে, শরীর ও মন খারাপ হ'লে, ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি এলে সাধারণ মানুষের মন কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হ'তে চায় না। কিন্তু মনীষী ম্যাক্‌ডুগ্যালের কথা মান্‌লে স্বীকার কর্‌তে হবে যে, জ্ঞানানুশীলনে মন যখন প্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত হয়, তখন এষণা বা প্রেরণা তাকে বিক্ষেপ থেকে ঠেকিয়ে রাখে। তিনি বলেছেন, —"Conation outlasts the cognition which initiates it." † এষণা আছে বলেই গবেষণা সম্ভবপর। স্কুলের ছেলে-

† An outline of Psychology P. 282

মেয়েরা যখন স্কুলের কাজকে গবেষণার ভাবে নিতে পার্বে—আনন্দের পরিবেশের মধ্যে, তখনই তাদের মনঃ-সংযোগের পরিচয় ও পরীক্ষা হবে। তখন আর মনন-শক্তির অপচয় হবে না।

বাধা পেলে অনেকে মনঃ-সংযোগ বেশী ক'রে করার প্রেরণা পায়, বিশেষতঃ পরীক্ষার সময়ে। পরীক্ষার্থীর তখন অনেক বেশী উদ্যম এবং সচেষ্টতা প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ রকমের উদ্যমে শক্তির অপচয় ঘটে, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

শিক্ষক তাঁর ছাত্রের মনোযোগ কি ভাবে আকৃষ্ট করবেন—ছেলের বয়সের প্রভেদের অনুপাতে, তা রস্ সাহেবের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন,—

"(The young teacher) must ever appeal to an interest—an instinct, a sentiment, or the self, according to his pupil's stage of development."

পুনশ্চ—

"Volitional attention and character-training go hand in hand; and success in obtaining volitional attention is proportional to success in the wider task of training character."

ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্র-গঠনই শিক্ষকের মুখ্য উদ্দেশ্য; মনোযোগ আকর্ষণ সেই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক। পরাবিদ্যার দেশে যোগ-সাধন-তত্ত্ব নূতন কথা নয়। অধ্যাত্ম-যোগ এ দেশের জন্মভূমি। সুতরাং অপরাবিদ্যা-অর্জনেও মনঃ-সংযোগ যে উন্নতির প্রথম পৈঁঠা, তা কাউকে বোঝাতে হবে না। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন

যোগসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ। কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, শিল্প-কলা, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ এবং নানা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে মনঃসংযোগ যে "ছাত্রানাং তপঃ," সে-কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রণালীগত পার্থক্য পাশ্চাত্যদেশের ধারার সঙ্গে থাক্‌তে পারে। সেকালে অবরোহ প্রথার আদর ও প্রচলন ছিল বেশী। আরোহ-প্রথা ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই জন্য স্মৃতিশক্তির মূল্য ও প্রাধান্য ছিল অত্যধিক। বিচারশক্তি ছিল তার বাঞ্ছিত ফল। বিচারশক্তিতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকটিত হ'ত। শুধু এর ওপরই চরিত্রশক্তি নির্ভর কর্‌ত না। মানুষের চরিত্র আরও অনেক বড় জিনিস, ভারতীয় শাস্ত্রপাঠে তা বোঝা যায়।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান স্মৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমাদের জ্ঞান-মূলক ছোট-বড় ঘটনা মনের ওপর দাগ কাটে, ঐ দাগ দিয়ে পুনরায় চলে যে অভিজ্ঞা, তার নাম স্মৃতি। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে,—'mneme'—স্মৃত্যাভ্যাস ; 'স্মৃতি' কথাটির তাৎপর্য ততখানি ব্যাপক নয়। পূর্ববর্তী কোন ঘটনার পুনঃ-সংগঠনকে 'স্মৃতি' বল্‌বো না ; স্মৃতি হচ্ছে কোন পূর্ব-সংঘটিত ঘটনা বা অবস্থার স্মৃতি। জীবনের কোন একটি ব্যাপার, যা আগে ঘ'টে গেছে, তা যেন পাতাল-পুরীতে প্রবেশ ক'রে বিলুপ্ত হয়েছে ; স্মৃতি তাকে টেনে তু'লে আনে, এ কথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু এ ধারণাটি ভুল। নূতন অবস্থায় প'ড়ে মন যখন সজাগভাবে পুরাতন অবস্থার ওপর আলোকপাত করে, তখনই আসে স্মৃতি।

নিখুঁত সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা না ক'রে এখন আমরা দেখ্‌বো স্মৃতি-ব্যাপারে আঙ্গিক উপাদান কি কি। প্রথমে, কোন বিষয় বা ঘটনার **পরিগ্রহ** (Registration) ; দ্বিতীয়তঃ—কোন অতীত অভিজ্ঞতার **সংরক্ষণ** (retention) ; তৃতীয়তঃ, অতীত অভিজ্ঞতার **পুনরাহ্বান** (reproduction) ; চতুর্থতঃ, পুনরাহূত অভিজ্ঞতার **স্বীকৃতি** (recognition)। এই চারটি ব্যাপার পর্যায়ক্রমে ঘট্‌লে স্মৃতি সম্ভবপর হয়। কোনটির মূল্য কম নয়। সব-চেয়ে মূল্যবান্ প্রথম জিনিসটি অর্থাৎ কোন বিষয় বা ঘটনার পরিগ্রহ—অনুভূতি—অভিজ্ঞতা। যখন আমার টেনিস্ খেলার স্মৃতি

মনে জাগে, তখন টেনিস্-খেলার কলা-কৌশল বা আর্ট ভাবি না, —ভাবি হয়ত কোন বিশেষ দিনের বিশেষ রকমের খেলা, যা আমি খেলেছি। টেনিস্-খেলার অভ্যাস আমার মনের পথে দাগ কেটেছিল এবং মনকে সেইভাবে প্রবৃত্ত ক'রেছিল। স্মৃতির অন্যান্য অঙ্গ বা ধাপগুলি ক্রমিক এবং সামগ্রিক ভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

স্মৃতি-শক্তি সকলের এক রকম হয় না। কেউ বা অনেক-কষ্টে-শেখা জিনিস খুব অল্প সময়ে ভুলে যায়। কেউ বা খুব শীগ্‌গির শেখে—আর ভোলে না। কেউ যেমন চট্ ক'রে শেখে, তেমনি চট্ ক'রে ভোলে। আবার, কোন কোন লোক খুব দেরীতে শেখে, ভোলেও খুব দেরীতে। [১ম শ্রেণী চির-বেগা ; ২য় শ্রেণী বেগ-চিরা ; ৩য় শ্রেণী বেগ-বেগা ; ৪র্থ শ্রেণী চির-চিরা।] ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতি-শক্তির এই পার্থক্য শিক্ষকের জানা দরকার। জান্‌লে তাঁর কাজের সাহায্য হয়।

আমরা দেখি, কোন কোন লোকের নাম ও অঙ্কের হিসাব খুব মনে থাকে। কেউ বা ভাষা শেখে অতি সহজে। কোন কোন লোক অন্য লোকের একবার-দেখা মুখ সহজে বিস্মৃত হয় না। কেউ আবার তার বিশেষ রুচি-সঙ্গত বস্তুকে মনের মধ্যে আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখে ; কেউ বা যে কোন বিষয়েই তার মনকে নিবিষ্ট ক'রে তার স্মৃতিকে জাগরূক রাখে। অসাধারণ মানস-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি গণিত বা ভাষাতত্ত্বের দুরূহ খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেগুলিকে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত ক'রে রাখে। বৃদ্ধবয়সে স্মৃতি-শক্তি শিথিল হয়। শৈশবে, সাধারণতঃ, এই শক্তি প্রখর থাকে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত স্মৃতি-শক্তির বিবর্ধন ঘটে ; তার পর আর বৃদ্ধি হয় না।

মনোবিজ্ঞানবিদ্ ষ্টাউট্ সাহেব স্মৃতি-শক্তির চারটি চিহ্ন আবিষ্কার ক'রেছেন। প্রথম—কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার পুনরাবর্তনের দ্রুততা। দ্বিতীয়—স্মৃতির স্থায়িত্ব। তৃতীয়, স্মৃত বিষয়ের পুনর্গ্রহণে তৎপরতা। চতুর্থ, পুনর্গ্রহণে নিখুঁত অবস্থা। এর মানে, যার স্মৃতি যত প্রখর, সে নির্দোষভাবে, অপরিবর্তিতভাবে, তার মনে-রাখা জিনিসের ততটা পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এই ভাবে তৈরী যারা, তারা যে-কোন প্রয়োজনে—স্মৃতি-শক্তির প্রয়োগে নিজেদের মতের প্রাধান্য বা মনের শক্তি-প্রাচুর্য্য প্রমাণিত করে। যে শিক্ষার্থীর স্মৃতি ধারাল, তার পরীক্ষা-পাশের দুর্ভাবনা অল্প।

স্মৃতি-শক্তির উপাদান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পূর্বে আমরা নিঃসন্দেহে জেনে নিতে পারি—উত্তম স্বাস্থ্য স্মৃতি-শক্তির সহায়ক। স্বাস্থ্যহীনের স্মৃতি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় সহায়ক মনঃ-সংযোগ। এক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, কোন বিষয়ে রুচি বা প্রীতি মনঃ-সংযুক্তির জননী। আবার মনঃ-প্রযুক্তি স্মৃতি-শক্তির জননী। সুতরাং স্মৃতিকে আয়ত্ত করতে হ'লে—তবে প্রসূতি এবং মাতামহীকে আয়ত্ত করতে হবে। এই মন্তব্যটি বেশ রসাল, অথচ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্মৃতি-শক্তির তৃতীয় সহায়ক—শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় বিষয়ের স্পষ্টতা। মানস-পটে যে বিষয়ের ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে ছবির মত পড়ে, তার স্মৃতি হয় অক্ষয়। দুর্ঘটনা-দুর্দৈবের স্মৃতি মানুষের মনকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। স্মৃতির চতুর্থ সহায়ক পুনরুক্তি। পুনঃ পুনঃ যে পাঠ অভ্যাস করা যায়, তার স্মৃতি হয় তত উজ্জ্বল। শুধু পুনরুক্তি নয়,

তৎসঙ্গে চাই নিয়মিত অভ্যাস। তবেই পঠিত বিষয়ের স্মৃতি প্রখর হ'তে পারে।

বয়সের সঙ্গে স্মৃতির তারতম্যের অনেক পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। টাট্‌কা মনে রাখার ব্যাপারে (immediate memory) প্রমাণ পাওয়া গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর চাইতে মনে রাখে বেশী। পণ্ডিত ময়ম্যান্ (Meumann) পরীক্ষাগ্রহণের ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন, যে-কোন বালকের ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত স্মৃতি-শক্তির বিকাশ হয় ধীরে। ১৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত বিকাশ হয় খুব দ্রুতগতিতে, এবং ২৫ বছরে পৌঁছে চরম উন্নতি। সুতরাং কৈশোর স্মৃতি-প্রাখর্যের সব চেয়ে প্রধান সময়।

কিন্তু রস্ সাহেব বলেন, শিশু শেখা-জিনিস মনে রাখে পূর্ণবয়স্কের চাইতে বেশী। ১১ কি ১২ বছরে এই মনে ধ'রে রাখার ক্ষমতা খুব বাড়ে, তার পর ক'মে আসে। রাস্ক্‌ বলেন, "Learn young, learn fair", অর্থাৎ "যত কচি, তত শুচি।" উড্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব ছেলেদের কবিতা মুখস্থ করা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ক'রেছেন। একটি শিক্ষার্থী ২৪০ লাইন দীর্ঘ দু'টি কবিতা দুই প্রণালীতে মুখস্থ কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। একটি সম্পূর্ণ কবিতা (২৪০ পংক্তির) দিনে তিনবার ক'রে পড়েছিল এবং সমগ্র কবিতাটি নির্ভুলভাবে, না দেখে, আবৃত্তি কর্‌তে তার দশ দিন লেগেছিল। সব শুদ্ধ তার ৩৪৮ মিনিটের মনঃ-সংযোগ ও প্রচেষ্টা দরকার হয়েছিল। বাকী কবিতাটি সে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে মুখস্থ করে। এক এক বারে ৩০ লাইন ক'রে মুখস্থ করে। ১২ দিনে সম্পূর্ণটি আয়ত্ত হয়। এবারে তার ৪৩১ মিনিট্ লাগে। সুতরাং প্রথম প্রণালী অবলম্বনে

তার ৮৩ মিনিট্ বাঁচে। উড্ওয়ার্থ্ বলেন, সামগ্রিক আবৃত্তি খণ্ডিত আবৃত্তি অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। আবার, উইন্চ্ সাহেব বলেন, খণ্ডিত আবৃত্তিই ভাল, বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে। কেননা, বড় একটা কবিতা একবারে শিখ্তে বল্লে তারা অনেক সময়ে ভড়্কে যেতে পারে, মনঃ-সংযোগে বাধা জন্মিতে পারে। কিছু বয়স হয়েছে যাদের, তাদের পক্ষে সামগ্রিক নীতি হয়ত ফলপ্রদ হয়।

শ্রেণীগত শিক্ষণ-নীতির প্রধান জ্ঞাতব্য এই,—শিক্ষার্থী যখন স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে কোন বিষয় আয়ত্ত কর্তে যাচ্ছে, তখন চারদিক্ থেকে তার চিত্তাকর্ষণ কর্তে হবে এবং তদনুসারে তার অভ্যাস-গঠন করাতে হবে। একে ইংরেজিতে বলে—"multiple sense appeal"। শ্রেণীতে নূতন শব্দ শেখাতে গিয়ে শিক্ষক শব্দগুলি উচ্চারণ কর্বেন, বানান বোর্ডে লিখে দেবেন ও ছেলেদের দিয়ে বলাবেন, আবার ছেলেরা তা দেখে নিজেদের খাতায় লিখ্বে। এতে একই সঙ্গে তাদের কাণ, চোখ ও মাংস-পেশীর ক্রিয়া চল্বে। স্মৃতি-শক্তির প্রথম দফা— **পরিগ্রহ** (Registration) এইভাবে সম্পন্ন হবে।

স্মৃতি-শক্তির দ্বিতীয় দফা—অর্জিত জ্ঞানের **সংরক্ষণ** (Retention)। পূর্বেই এর নাম দেওয়া হয়েছে ধৃতি বা ধারণ-শক্তি। স্নায়ু-ক্রিয়া-জাত অভ্যাসের পথ সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে। অভ্যাসকে ইংরেজীতে বলা হয় disposition, বা মনঃ-প্রকৃতি-গঠন। মস্তিষ্কে অঙ্কিত পথের তারতম্য অনুসারে লোকের ধারণা-শক্তির তারতম্য ঘটে। এ তারতম্যের পরিবর্তন-সাধন শিক্ষকের

অধিকারের বাইরে, কেননা এ জিনিসটি বহুলাংশে প্রকৃতি-দত্ত শারীর ব্যাপার। কৃত্রিম অনুষ্ঠানের দ্বারা অথবা পরিবেশ-সৃষ্টির দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর দৈহিক পরিবর্তন আনা সুকঠিন।

স্মৃতি-শক্তির তৃতীয় দফা—অতীত **অভিজ্ঞতার পুনরাহ্বান** (recall বা reproduction)। পুনঃ-স্মৃতি দু'রকমে ঘটে, স্বাভাবিকভাবে এবং চেষ্টার ফলে। আমরা যখন নিশ্চিন্ত ও নিরঙ্কুশভাবে মনকে ছেড়ে দিই—হয়ত আহারাদির পর, না হয় কোন স্বচ্ছন্দতার মধ্যে, তখন বিনা প্রযত্নে মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চ'লে যায়—মালা গাঁথার মত। তখন কত পূর্বস্মৃতি, কত আশা-নৈরাশ্য, কত সুখ-দুঃখ, অতীতের কত রিক্ততা ও তিক্ততা, সুখ ও শান্তির স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। তাদের পুনরাবির্ভাব ঘটে অতি স্বাভাবিক গতিতে। আবার, নূতন কোন অবস্থার বিপাকে পড়্‌লে, কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে—আমরা অতীত অভিজ্ঞতা-মূলক স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি। মনের গভীর-তলায় পূর্ব-স্মৃতিগুলির নির্বাচন ও নির্ঘণ্ট চল্‌তে থাকে। নূতন অবস্থায় যেগুলি খাপ্‌ খায়, কেবল সেগুলিকেই সাগ্রহে বরণ করি। এ ক্ষেত্রে স্মৃতি স্বাভাবিক নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। বিস্মৃত বিষয়ের পুনঃ-স্মরণে আমরা অনেক সময়ে জব্দ হই। অনেক জানা নাম মনে পড়ে না—হাজার চেষ্টাতেও না—মাথা খুঁড়েও না। আবার, সহসা আলোকপাতের মত নিতান্ত অসময়ে, এমন কি নিষ্প্রয়োজনে মনে প'ড়ে যায়। মানব-প্রকৃতির এ রহস্য শিক্ষকের অজ্ঞাত থাক্‌লে চল্‌বে না। অনেকে জানেন, কোন জিনিস মন থেকে এইভাবে উধাও হয়ে গেলে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যে চুপ্‌ ক'রে থাকা উচিত, পুনঃ-স্মরণের চেষ্টা না করাই

উচিত। তাহ'লে দেখা যায়, প্রয়োজনের বেলায় পূর্ব-বিস্মৃত বিষয়টি স্মৃতির দ্বারস্থ হয়ে ব্যঙ্গ করছে স্মৃতির অধিকারীকে।

এই প্রসঙ্গে চিন্তা-সূত্র বা চিন্তা-সঙ্গতির (Association of ideas) কথা ওঠে। চিন্তা-সঙ্গতি অথবা পারম্পর্য একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। আমি যখন পড়্‌তে ব'সে এঞ্জিনের ফুঁ শুনি, তখনই মন রেলগাড়ীতে চেপে দূর-দূরান্তরে চলে যায়। কত লোক, কত মুখ, কত ভীড়, কত প্ল্যাট্‌ফরম্, কত স্থান, কত ঘটনার স্মৃতি—একের টানে আর একটি চলচ্চিত্রের ফিতার মত মনের মাঝারে সঙ্গতি রক্ষা করে। মন তখন নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়।

কিন্তু এই যে সঙ্গতি, এই যে স্মৃতি-প্রবাহ, এর মধ্যে নিয়ম-সূত্র ক্রিয়াশীল। বহু শত অভিজ্ঞতা, বহু শত ছিন্ন চিন্তার মধ্য থেকে প্রয়োজনানুরূপ চিন্তারাশি আমাদের মন স্মৃতির মাধ্যমে গ্রহণ করে। এই পুনরাভিনয়ে কয়েকটি জিনিস চাই। **নূতনত্ব, পৌনঃপুন্য, প্রাবল্য** এবং **প্রবণতা**—চিন্তা-সঙ্গতির উপাদান (উপাশ্রয়) (Recency, frequency, intensity এবং attitude)।

"যে বিষয়টি আমাদের জীবনে সচরাচর ঘটে বা পুনঃ পুনঃ আসে, সাধারণতঃ তাহাই সর্বাগ্রে মনে পড়িয়া থাকে।"‡ ইংরেজি "ডেট্" কথাটি শুনে ইতিহাসের ছাত্র মনে কর্‌বে তারিখ, ফল-ব্যবসায়ী ভাব্‌বে খেজুর, মহাজন মনে কর্‌বে ঋণ। যে বিষয় নিয়ে আমরা কারবার করি, আমাদের স্মৃতির পুনরুদ্রেক হয় সেই সম্পর্কে, অনভ্যস্ত বিষয়ে নয়। এই স্মৃতির মূলে পৌনঃপুন্য (Frequency)।

‡ "মনোবিজ্ঞান"—লেখক—শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার। পৃঃ ১৩৬

নূতনত্ব চিন্তা-সঙ্গতির আর একটি উপাদান। শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার তাঁর "মনোবিজ্ঞান" গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন,—

"যাহা বহু পূর্বে ঘটিয়াছে এবং যাহা অতি সম্প্রতি ঘটিয়াছে—এইরূপ দুইটি বিষয়ের মধ্যে কাহার কথা মনে পড়ার সম্ভাবনা বেশী? যাহা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহার স্মৃতি নবীন ও সতেজ থাকে, তাই তাহার কথাই আমাদের সহজে মনে পড়ে। 'বাল্যবন্ধু' বলিলে আমি যে-কোন বাল্যবন্ধুর কথা স্মরণ করিতে পারি সত্য; কিন্তু তাহাদের একজনের সহিত গতকল্য যদি আমার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তবে এখন তাহার কথাই মনে পড়ার সম্ভাবনা বেশী, অপর বন্ধুদের কথা নহে।" (Recency)।

চিন্তা-সঙ্গতির তৃতীয় উপাদান **প্রাবল্য,** অর্থাৎ ঘটনার সতেজ প্রখরতা। শ্রীমজুমদার লিখেছেন,—"যে ঘটনা আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যদি তীব্র ও জ্বলন্তভাবে তখন আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে সেই ঘটনাটি স্মরণ করা আমাদের পক্ষে স্বভাবতঃই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। 'প্রাণদণ্ড' শুনিলে আমরা সাধারণতঃ দড়ি দিয়া ফাঁসি বা গুলি করিয়া বধের কথা ভাবিয়া থাকি; কিন্তু তুমি যদি জেলে কখন ফাঁসি দেখিয়া থাক, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে কথোপকথনকালে অন্য কোন প্রকার শাস্তির বিষয় না ভাবিয়া ফাঁসির কথাই খুব সম্ভব মনে করিবে। কারণ, এই ফাঁসির দৃশ্য এত জ্বলন্ত ও তীব্রভাবে মনের উপর ক্রিয়া করে এবং এত প্রবল ও প্রখর স্মৃতি-চিহ্ন রাখিয়া যায় যে ইহার কথা শীঘ্র ভুলা যায় না; বহুদিন ইহা সতেজ এবং সবল থাকে। তাই এই প্রকার কোন বিষয় আলোচনা করিবার

সময় সেই ফাঁসির দৃশ্য স্বতঃই তোমার মনের উপর ভাসিয়া উঠে।” (Intensity)।

চতুর্থ উপাদান—**মনের প্রবণতা,** অথবা আমাদের তদানীন্তন মানসিক অবস্থা। স্ফূর্তির জন্যে যখন এরোপ্লেনে চড়ি, তখন দুনিয়াটাকে ভাল লাগে, তুচ্ছ গৃহের কথা স্মরণ করি না। আবার, ছেলের উৎকট অসুখের খবরে যখন প্লেনে চলি, তখন দুনিয়া সংকীর্ণ হ'য়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; আর মন তখন রোগ-শয্যার চারপাশে ঘোরা-ফেরা করে। স্মৃতিতে তখন অন্য কোন কিছুর প্রভাব নেই। কেউ কেউ Association-কে “অনুষঙ্গ”—এই নাম দিয়েছেন।

এখন বিস্মৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক্। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার আগে ব্যালার্ড্ সাহেবের লিখিত একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

* “সহরের উপকণ্ঠস্থিত একটি নোংরা বস্তির একটি স্কুলে ছেলেরা নাকি কিছুই মনে রাখ্তে পারে না। কোন কিছু পড়্লে তারা নাকি অতি সহজেই ভুলে যায়। তখন আমি শীর্ষশ্রেণীর ছেলেদের পরীক্ষা নিলাম। তাদের প্রত্যেকের বয়স ছিল গড়ে বারো বছর দশ মাস। কবি কাউপারের “লস্ অব্ দি রয়্যাল্ জর্জ্” (Loss of the Royal George) কবিতাটি মুখস্থ লিখ্তে দিলাম। প্রত্যেককে কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি কর্তে দেওয়া হ'ল ১৩ মিনিট্। পরে বলা হ'ল,—“স্মরণ ক'রে

* Dr. P. B. Ballard—“Obliviscence and Reminiscence”—
(Brit. Journal Psych., Monograph Supplement No.2)

যত লাইন্ পার, লেখ।" ছেলেদের অনেককে বাদ্-সাদ্ দিয়ে পরীক্ষার্থী টিঁক্‌লো ১৯ জন। ৩৬ লাইনের কবিতাটি সম্পূর্ণ লিখ্‌লো একটিমাত্র ছেলে। গড়ে প্রত্যেকে লিখ্‌লো ২৭.৬ লাইন। দু'দিন বাদে ছেলেদের আবার পরীক্ষা করা হ'ল। এবারে বলা হ'ল—যা মনে আছে তাই লিখ্‌তে। সেই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র কেউ এই আকস্মিক দ্বিতীয় পরীক্ষার কথা কল্পনাও করে নি। পুনরালোচনার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। আশ্চর্য ব্যাপার এই, এবারে ৮টি ছেলে সমগ্র কবিতাটি নির্ভুলভাবে লিখে দিল। গড়ে শুদ্ধ পংক্তির সংখ্যা হ'ল ৩০·৬। পূর্বের চাইতে গড়ে শতকরা দশ-বৃদ্ধি। ঐ ১৯টি ছেলের—একজনও বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায় নি। ১৬টি ছেলের পূর্বাপেক্ষা উন্নতি দেখা গেল। এই চমকপ্রদ ফল দেখে আমি আরও কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ করি। সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচের স্কুল। সব জায়গাতে একই ফল পরীক্ষিত হ'ল। কবিতা শেখার ঠিক পরে যা হয় নি, দু' দিনের অন্তরালে তার চাইতে অনেক বেশী সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল।"

কবি কোল্‌রিজের "Ancient Mariner"-নামক দীর্ঘ কবিতার ২য় খণ্ড থেকে ৩৪ লাইন স্থির ক'রে মুখস্থ লিখতে দেওয়া হয় ৫১৯২টি ছেলে-মেয়েকে। এই বিরাট পরীক্ষার ফলে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন—স্মৃতি ও বিস্মৃতির ক্রিয়া শিশু-মনে একই সঙ্গে চলে, পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। দু'দিনের অবকাশে ছেলেদের বিস্মৃতি না ঘ'টে স্মৃতির প্রখরতা জন্মেছে। অর্থাৎ শিক্ষকের বিস্ময় জন্মিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

অনেক পরীক্ষা ক'রে এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে ব্যালার্ড্ সাহেব কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেন, অবকাশ কালে ছেলেরা পরীক্ষিত বিষয়ের কথা আদৌ না ভেবে—লেখার বেলায় উন্নতির চিহ্ন দেখায়। যারা একটু আধটু পুনরালোচনা করে তারা আরও মনোজ্ঞ ফল দেখায়। আগ্রহ বা আকর্ষণ (interest) থাক্‌লে উত্তম ফল অনিবার্য। ছেলের বয়সের তারতম্য অনুসারে উন্নতির তারতম্য ঘটে। ছোটদের উন্নতি বেশী দেখা যায়—বড়দের চাইতে। স্মৃতি এবং বিস্মরণ যুগপৎ ক্রিয়াশীল হয়। দু'দিনের অবকাশ (এক পরীক্ষা থেকে আর এক পরীক্ষা পর্যন্ত) স্মৃতি-শক্তির বর্ধনের পক্ষে যথেষ্ট।

সুতরাং অবকাশ যেমন এক পক্ষে বিস্মরণ ঘটায়, অন্যপক্ষে তেমনি স্মৃতি-শক্তির সহায়ক হয়। বিস্মৃতি জিনিসটি অকাম্য নয়। আমরা যদি জীবনের সব খুঁটি-নাটি মনে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে হয়ত পাগল হ'য়ে যেতাম ; মাথা খারাপ হ'ত। প্রকৃতির প্রেরণায় আমরা বহু জিনিস বিস্মৃত হই। সন্দেহ, চিত্তবিক্ষেপ, অবসাদ ও ক্লান্তি-বোধ এবং বাধা-জনক আবেগ স্মৃতির স্বচ্ছতাকে আবিলতাময় করে। কিন্তু তাতে অহিত-সাধন বা ক্ষতি বড় ঘটে না। বিস্মৃত বিষয়গুলি অবচেতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। সজাগ মন কখনও কখনও তাদের টেনে তোলে চেতনার দিব্যালোকে।

আয়ুর্বেদে ভাবমিশ্র জীবের গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে বলেছেন—জীবের বহু গুণের মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, বিষয়জ্ঞান, প্রযত্ন, মনঃ-সংকল্প, বিচারবুদ্ধি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রধান। সুতরাং প্রকৃতিস্থ জীবের (মানবের) স্মৃতি একটি বিশেষ গুণ। স্মৃতির অপলাপ

ঘট্‌লে অপস্মার রোগ জন্মে। অপস্মারে হৃদয়ের শূন্যতা এবং বিস্মাপন (স্মৃতির অপগমে—নূতন কিছুর ধ্যান—অলীক ধ্যান) উপস্থিত হয়। মনোমোহ-সৃষ্টি হয়। উন্মাদ-রোগে ধীবিভ্রম, অসংলগ্নবাক্য এবং শূন্যহৃদয়তা মানবকে আশ্রয় করে। ধীবিভ্রম এবং অসংলগ্নবাক্য বিস্মৃতির নামান্তর। এ অবস্থা অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় বিস্মৃতি—সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা প্রচলিত আয়ুর্বেদগ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনশ্চিকিৎসা-প্রসঙ্গেই উন্মাদ ও অপস্মার রোগের বিশদ বিবরণ আছে। বাতব্যাধিতেও জিহ্বাস্তম্ভ, বাচালতা, প্রলাপ এবং রসবোধের অভাব—কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ। বাতব্যাধি না থাক্‌লে—লোকের স্মৃতিরথ ঠিক পথে চলে। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মূলে মানুষের স্নায়ুশক্তি। স্নায়ু শিরার সূক্ষ্মাংশ। মেদের স্নেহপদার্থ গ্রহণ ক'রে শিরা স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরাগুলির পাক মৃদু, স্নায়ুর পাক খরতর। এখানে 'পাক' অর্থে জীবনায়ন। এই জীবনীশক্তিতে দেহ ও মনের সমান স্থান। আমাদের নূতন বিজ্ঞানীরা পুরাতনের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হলে—দেশের অগ্রগতি সার্থকনামা হবে।

শিক্ষা-গ্রহণ এবং অবসাদ

স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে আমরা যে শিক্ষা-লাভ করি, পতঙ্গ ও পশুরাও সেই শিক্ষা লাভ করে। কেবল তাদের ধাপ নীচে আর বুদ্ধি-সীমা সংকীর্ণ। মানুষ শেখে দেরীতে, কিন্তু শেখে সব-চেয়ে বেশী। মানুষের শেখার শেষ নেই। কিন্তু প্রথমে সুরু করে ভুলের রাস্তা দিয়ে। ভুলের পরখ্ (পরীক্ষা) কর্‌তে কর্‌তে ঠিক জিনিসটি শেখা। ইঁদুর যখন খাবারের খাঁচায় ঢোকে, তখন অনেক ঠোকর খেয়ে, অনেক ভুল দরজা এড়িয়ে, ঠিক দরজাটি বের ক'রে ঢোকে। পোষা কুকুর বাড়ীর গেট্ খুল্‌তে গিয়ে অনেক ধাক্কা খায়। গরু কাঁটা-দেওয়া বেড়া পার হ'তে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। তেম্‌নি, শিশু চামচ দিয়ে খাবার খেতে কখনো নাকে গোঁজে, কখনো তার খাবার প'ড়ে যায়। জুতো-পরা শিখ্‌তে বেশ হিম্‌সিম্ খেতে হয়। যুবক গাড়ী চালানো শিখ্‌তে, টেনিস খেলা শিখ্‌তে—বহু ভুল করে—তবে শেখে। শেখার এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলে—trial and error method। ভুলের সংখ্যা ও গুরুত্ব ক্রমশঃ কম্‌তে থাকে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা শিক্ষা আয়ত্ত হয়। এই পদ্ধতিতে সময় লাগে প্রচুর। পশুদের এ ছাড়া পথ নেই। কিন্তু মানুষের অন্য উপায় আছে। সে উপায় বুদ্ধি-প্রয়োগের, observation বা সমীক্ষার। অন্তর্দৃষ্টি এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ে অনুপ্রবেশ মানুষের আবিষ্কার। এ আবিষ্ক্রিয়া পশুর পক্ষে

সুকঠিন। পশুদের শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নানা মত। ভাষা শিক্ষার জন্যে মানুষ এই পন্থা আশ্রয় করে।

থর্ণডাইক্ লিপিবদ্ধ ক'রেছেন—শিক্ষার তিনটি মৌলিক নীতি। এদের ইংরেজি নাম যথাক্রমে—(১) Law of exercise, (২) Law of readiness এবং (৩) Law of effect। বাংলায় বলা যায়, অভ্যাস-নীতি, প্রস্তুতি এবং ফলোদয়। অভ্যাস যে সব শিক্ষার গোড়ার কথা, তা চেষ্টা ক'রে বুঝতে হয় না। অভ্যাসে ভাটা পড়্‌লে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়। প্রস্তুতির অর্থ মনের তোড়্-জোড়। মন একাগ্র না হ'লে অভ্যাসে প্রবৃত্তি হয় না, অভ্যাস-গঠনও হয় না। প্রস্তুতির একটি সহায়ক কোন কিছুর নূতনত্ব। শ্রেণী-গত পাঠে দেখা যায়, অভিজ্ঞ শিক্ষক নূতন বা টাট্‌কা কোন বিষয় অবলম্বন ক'রে ছাত্রদের মনকে একাগ্র কর্‌বার, অর্থাৎ প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেন। সূর্য-গ্রহণ, চন্দ্র-গ্রহণ, বন্যা, ভূমিকম্প, রেল-সংঘর্ষ প্রভৃতির যে কোন একটী বিষয়কে সূত্রস্বরূপে গ্রহণ করে শিক্ষক ছাত্রের মন আকর্ষণ করেন; ছাত্র তখন প্রস্তুত হয়। শিক্ষালাভের আনন্দ শিক্ষার সুফল। কোন ছেলে যদি আঁক্ ক'ষে বা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার শুদ্ধ সমাধান ক'রে শিক্ষা-লাভ করে, তখন তার মনে পুলক জাগে। সে নূতনতর ও কঠিনতর সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। পুরস্কার-প্রীতি এবং তিরস্কার-ভীতি—এই শিক্ষা-নীতির অন্তর্গত। অর্থাৎ শিক্ষার ফল-লাভে উভয়ের মূল্য যথেষ্ট।

কিন্তু প্রায় দেখা যায়, শিক্ষা ও অভ্যাসলব্ধ জ্ঞান অগ্রসর হ'তে হ'তে থম্‌কে যায়। পাহাড়ের উঠ্‌তি-মুখে এ যেন একপ্রকার

সমতল-ক্ষেত্র। অনেক দূর ঠেলে উঠে খানিকটা প্রশস্ত স্থানে অবকাশ। এর ইংরেজি নাম "প্লেটো" (plateau)। হাতের—হাতিয়ারের শিক্ষাতেই—'প্লেটো' বা অনগ্রসর অবস্থা উপস্থিত হয় বেশী। তখন শিক্ষকের কর্তব্য—ছাত্রের কাজের মধ্যে রুচি ও সামর্থ্য-গত ভাগাভাগি এবং যথেষ্ট বিশ্রামের ব্যবস্থা। এই বিশ্রামে অবসাদ দূর হয়। অসম্পূর্ণ-ভাবে অভ্যস্ত বিষয়গুলি জমাট বাঁধ্‌বার অবসর পায়। শিক্ষক তখন নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেবেন—প্রতি ছাত্রকে তার শিক্ষণীয় বিষয় অধিগত কর্‌তে। ছাত্রের যোগ্যতার তারতম্যও তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন কর্‌বেন। তা হ'লে হাতের কাজ ও মস্তিষ্কের কাজ সমভাবে অগ্রসর হবে।

শিক্ষা-গ্রহণের এই অগ্রগতির প্রসঙ্গে আর একটি জটিল তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানীদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এক বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান বা অভ্যস্ত শিক্ষা বিষয়ান্তরে উপসৃত হয় কি না। কেউ কেউ বলেন, শব্দের অর্থ মুখস্থ করলে, ইতিহাসের সন-তারিখ অথবা গণিতের নামতা কণ্ঠস্থ করলে যে শক্তি জন্মে, তা দিয়ে অন্য বিষয় আরও ভাল ক'রে শেখা যায়। বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলনে পর্যবেক্ষণ-শক্তি সৃষ্ট হয়, ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করলে সে শক্তি আরও ধারাল হয়। ইংরেজ বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন—doctrine of formal discipline অথবা transfer of training। প্রাচীনপন্থীরা বিশ্বাস কর্‌তেন, স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধিতে কল্পনা ও ঈক্ষণ-শক্তির বৃদ্ধি হয়। আবার, যুক্তিপরায়ণতার পুষ্টিতে স্মৃতি ও কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি হয়। গণিত ও তর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ কর্‌লে নাকি সর্ব-বিদ্যায় বিশারদ হওয়া যায়। আধুনিকেরা

এই মতবাদকে একেবারে বর্জন ক'রেছেন। পূর্বকালে অনেক বড় বড় লোক, ডাক্তার, রাষ্ট্রপরিচালক, শিক্ষানায়ক, ল্যাটিন ভাষা ও গণিতশাস্ত্রে বিচক্ষণ হয়ে—বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস ক'রে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছিলেন। প্রাচীনপন্থীরা বল্‌বেন, তাঁরা সাধারণ শিক্ষার গুণে, সুফল লাভ ক'রেছিলেন। আধুনিকেরা বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার গুণে ততটা নয়, যতটা পরিবেশের ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে হয়।

অর্জিত জ্ঞান ও শক্তির সংবাহন কিংবা স্থানান্তরীকরণ (transfer) সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অনেক রকম পরীক্ষা ক'রেছেন। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে দু'টো দল গঠন ক'রে প্রতি দল থেকে বয়স, জাতি (স্ত্রী বা পুরুষ), বংশ, শিক্ষা, স্বাভাবিক বুদ্ধি-অনুসারে একটি একটি ক'রে ছেলে নির্বাচন ক'রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুই দলের প্রতিটি ছেলের ভিন্ন পরীক্ষা। কোন একটি ছেলের কোন একটি বিশেষ ক্ষমতার প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ ক'রে সেই বিষয়ে, সেই ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। পরে আবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ট্রেনিং দেওয়া হয় না ; তখন ট্রেনিং-প্রাপ্ত দলের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ধর্‌বার জন্যে শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই ভাবে শব্দ-শিক্ষার সঙ্গে সংখ্যা-পরিচয়ের অথবা আলোক-বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে শব্দ-বিষয়ক জ্ঞানের আদবেই কোন স্থানান্তরীকরণ (transfer) হয় কি না, অথবা হ'লে কতটুক হয়, পরীক্ষাদ্বারা তা বেশ উপলব্ধ হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলের দল অপর দলের অপেক্ষা বেশী কিছু সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারে নি।

দেখা যায়, গণিত ভাল ক'রে শিখ্‌লে পদার্থ-বিদ্যা সহজে শেখা যায়। মাতৃভাষায় জ্ঞান জন্মিলে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হয় না। টেনিস্-খেলা ভাল জান্‌লে ক্রিকেট্-খেলায় হাত আসে সহজে। টাইপিষ্ট্ হারমোনিয়ম বাজাতে শেখে অনায়াসে। সুতরাং কতকটা বলা যায়, এ সব বিষয়ে শিক্ষার ট্রান্স্‌ফার ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই, ট্রান্স্‌ফার বা সংবাহন শিক্ষা-গ্রহণে যতটা ফলপ্রদ মনঃ-সংযোগ তদপেক্ষা অনেক বেশী। স্পীয়ারম্যানের বুদ্ধি-পরিমাপ-সম্পর্কীয় দ্বিশক্তি-তত্ত্বের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণে মানুষের সাধারণ ও বিশেষ উভয় শক্তিরই বিকাশ হয়। নব-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, মানুষের বিশেষ শক্তির স্থানান্তরীকরণ (transfer) মোটেই হয় না; সাধারণ শক্তির, কিছু কিছু হয়।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়—অর্জিত শক্তির বা জ্ঞানের বা বিদ্যার অপগম এবং অপচয়। অপগম হয় একঘেঁয়ে খাটুনীর পর, শরীরের এবং মনের। তখন আসে অবসাদ (fatigue)। অবসন্ন দেহে ও মনে শিক্ষা-গ্রহণ হয় না। শিক্ষার্থী কাজ দেখাতে পারে না। তার কাজের পরিমাণ কমে যায়।

অনেক পিতামাতা এবং শিক্ষক মনে করেন, শিশুদের ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। তাদের কর্মশক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। বিজ্ঞান বলে, এ কথা সত্য নয়। বরঞ্চ শিশুদেরই বিরক্তি ও অবসাদ আসে তাড়াতাড়ি। কখনো বা অলীক অবসাদ আমাদের প্রতারিত করে। মনে হয়, অবসাদ এসেছে, কর্মস্পৃহা অপগত হয়েছে। কাজ ভাল লাগে না। তখন হয়ত প্রকৃতপক্ষে কর্মশক্তির ব্যত্যয় হয় নি;

শুধু কর্মে আনন্দ-বোধ, স্বার্থ-বোধ নষ্ট হয়েছে। এ অবস্থাকে ইংরেজিতে বলে boredom (বিরক্তি)। তখন কার্যান্তরে ব্যাপৃত হ'লে বিরক্তি ও অবসাদ থাকে না।

অবসাদের দৈহিক কারণটি চিত্তাকর্ষক। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে স্নায়ু ও মাংসপেশীর ক্ষয় ও পূরণ একসঙ্গে হ'তে থাকে। সুখাদ্য এবং স্বাস্থ্য-পরিবেশের ফলে যখন দেহে ক্ষয় ও পূরণ সামঞ্জস্যের সঙ্গে চলে, তখন কর্মশক্তি ঠিক থাকে, অবসাদ আসে না। ক্ষয়ের মাত্রা বেশী হ'লে অবসাদ অনিবার্য। অবসাদ দেহ থেকে মনে সঞ্চারিত হয়। শরীরের বিষাক্ত 'টক্‌সিন্' পদার্থ যত নির্গত হয়, ক্ষয় তত বাড়ে; অবসাদ তত আসে।

স্কুলে অবসাদ দূর করার প্রথম উপায়—কাজ বদ্‌লানো, অর্থাৎ বিষয়ের পরিবর্তন, রুটিনের পরিচালন। দ্বিতীয় উপায় বিশ্রাম, যেমন টিফিন্, ক্রীড়া-কৌতুক, কমন-রুমে সংবাদপত্র-পাঠ, ছবি-দেখা, কেরম্ বা বেগাটেল্ খেলা। তৃতীয় উপায় আগ্রহ ও আনন্দ-সৃষ্টি। শিক্ষক এ সম্পর্কে উৎসাহী হ'লে নানা চিত্তাকর্ষক উপায় অবলম্বন কর্‌তে পারেন। পরীক্ষা-পাশের প্রবৃত্তিকেও এই কোঠায় ফেলা চলে। চতুর্থ উপায়—সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ স্কুলে সারা দুপুর ছেলেরা স্কুলে থাকে ও খাটে। দিনের মধ্যভাগে গরম বল্‌কা দুধ খাওয়াতে পার্‌লে বা ঐজাতীয় অন্য রুচিকর পানীয় খাদ্য সরবরাহ কর্‌তে পার্‌লে শিশু ও তরুণদের অবসাদ দূর হয়। এ প্রস্তাব নূতন নয়, কিন্তু এ প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করার অনেক বাধা। স্বাধীন দেশে সে বাধা অপসারিত করার সময় এসেছে।

পঞ্চম উপায় অভ্যাস-গঠন। যে কাজ নূতন, অপরিচিত, এবং যাতে অধিকার জন্মায় নি, সে কাজ বিরক্তি আন্‌তে পারে। কিন্তু যে কাজ অভ্যস্ত হয়েছে, তাতে বিরক্তি জন্মাবার সম্ভাবনা অল্প। অভ্যাসের ফলে কর্মশক্তি মার্জিত হয়, দ্রুতগতি এবং দক্ষতা লাভ করা যায়। ছোট বড় সব ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এক কথা। হাতের কাজ ও মাথার কাজকে অন্তরিত হ'তে দিলে অবসাদ অন্তর্হিত হবে, সুনিশ্চিত।

চিন্তন ও বিচার

শিক্ষার্থীর চিত্তাশক্তি এবং বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে জাগিয়ে ও বাড়িয়ে তোলা শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। অবসাদ ও বিরক্তি না আসে, তা অবশ্য দেখ্‌তে হবে। স্বাধীন চিন্তা কর্‌তে শিখ্‌বে ছেলেরা এবং মেয়েরা ; শিক্ষক হবেন সহায়ক। তিনি থাক্‌বেন অন্তরালে, অর্থাৎ তিনি তৈরী কথার উপাদানে ছেলে বা মেয়ের উদীয়মান চিত্তকে ভরাট্ ক'রে দেবেন না। তাহ'লে তার চিন্তা-স্রোত ব্যাহত হবে। কোন একটি বিষয় অবলম্বন ক'রে প্রশ্ন জাগাতে হবে ; প্রশ্নের পর প্রশ্নের স্বাভাবিক অনুসৃতির সুযোগ দিতে হবে। এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা কর্‌তে হচ্ছে—চিন্তা-শক্তি জিনিসটি মূলে কি।

কোন একটি বিষয় জানি বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে, আমার মনে সেই বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি ও সম্পর্ক আছে এমন বিবিধ বস্তু রেখা-পাত ক'রে মনের মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছে, যাতে ক'রে আমার মন অনুভূতির সঙ্গে সক্রিয়তার অধিকারী হয়। এই বস্তুগুলি ঠিক্ বাহ্য পদার্থ নয় ; বাহ্যপদার্থের মানস প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতির স্তর-বিন্যাস অনুসারে আমার মনন-শক্তির (বা চিন্তাশক্তির) পরিচয় হয়। আমি যখন একটি কলমের দিকে তাকাই, তখন ঐ কলম বস্তুটি ভাবি কি ? ঠিক তা নয়। ঐ কলমটি থেকে 'ঈথর'-তরঙ্গ আঘাত করে আমার চোখে ; সেই সঙ্গে সুরু হয়, আমার দর্শনেন্দ্রিয়ে কতকগুলি প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক ক্রিয়া। তার পরেই আমার মস্তিষ্কে

স্নায়ু-ক্রিয়ার প্রবাহ চলে। তখনই অত্যাশ্চর্যরূপে শারীর এবং মানস্ শক্তির সমন্বয় ঘ'টে যায়। সেই মুহূর্তে কলম জিনিসটির মানস রূপ আমার চিত্তে প্রতিভাত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির (এখানে দর্শনেন্দ্রিয়) ফলে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়-বাহিত উত্তেজনা কলমের অনুভূতিরূপ বস্তুটিকে আমার মনে স্থাপন করেছে, কলম পদার্থটিকে নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এই উত্তেজক অনুভূতি মনন-ক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান উপাদান। মন এইরূপ বহু অনুভূতির নিখুঁত সংযোগ, যেন স্থপতির হাতে গড়া বিচিত্র বর্ণের মর্মর-প্রস্তরের সংযোজন (a mosaic of sensations)। অন্য ইন্দ্রিয়ের বেলায় একই প্রক্রিয়া। স্নায়ু-বাহনের পর মনন। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে অনুভূতি-স্রোত বয়ে যায়, বিবর্তনের নিয়মে, তার মধ্যে নির্বাচন হয়। নির্বাচন-ব্যাপারে ইন্দ্রিয়াতীত কোন শক্তি তরঙ্গিত হ'য়ে চিন্তনে পরিণত হয়। সুতরাং চিন্তন একটি জটিল ব্যাপার, বাইরে যত সহজ মনে হোক্ না কেন।

অনুভূতি-মূলক চিন্তনের (perceptual thinking) পর আসে কল্পনা-মূলক চিন্তন (imaginative thinking)। এ দু'টি জিনিস ভিন্ন প্রকারের নয়, ভিন্ন স্তরের। কল্পনামূলক চিন্তনের প্রধান অবলম্বন স্মৃতি। একখানা বই দেখার পর যখন চোখ বুঁজি, মনের চোখে তখন বইখানা আবার দেখি। তার ছবি-খানি মনের ওপর আঁকা হয়। অনেক দিনের শোনা গান যখন মনে মনে আওড়াই, তখন গানের ছবি মনের ওপর আঁকা হয়। এ ছবি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাহনে আঁকা। যখন কল্পনায় গোলাপ ফুলের গন্ধ অনুভব করি, তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহিত চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হয়। আমরা

কল্পনায় ক্ষুধার্ত হই, শীত-বোধ করি—অসুস্থ হই। ছোট ছেলে-মেয়েরা কল্পনা-কুশল বেশী। সুতরাং তাদের চিন্তন-ব্যাপারে অনুভূতি (perception) এবং কল্পনা (imagination)—দুয়েরই সমান মূল্য। তারা দু'টি একটি ক'রে, পৃথক্ ভাবে, চিন্তা কর্‌তে শেখে; পরে শেখে পাইকারিভাবে (সাধারণ ভাবে) চিন্তা কর্‌তে। শিশুর কুকুর-চেনা হয় প্রথমে একটি দু'টির চিন্তনে; পরে 'কুকুর' নামক বস্তু-ব্যতিরিক্ত একটি "আইডিয়া" তার মনকে অধিকার ক'রে ব'সে থাকে। Concrete কুকুরের জায়গায় abstract কুকুর আসে। এই সাধারণীকরণের ব্যাপারে ভাষার মূল্য অত্যধিক।

'কুকুর'—এই কথাটি মনে আস্‌বামাত্র একটি নির্দিষ্ট জীবের আকৃতি-প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা-সূচক একটি সাধারণধর্ম-দ্যোতক শব্দ ও তার পশ্চাতে একটি ছবি যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়। সুতরাং 'কুকুর' নামক মানস বস্তুটির দুই দিক্; একটি বিশেষ, অপরটি সাধারণ। এই সাধারণ-বিশেষের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য নিয়ে মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বিতর্ক-কোলাহল হয়ে গেছে। তাঁদের মতবাদের নিঃসরণে তিনটি তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। (Realism, nominalism এবং conceptualism)। বস্তুবাদিগণ (Realist) বস্তুমাত্রের সাধারণ ধর্ম মান্‌তেন, বিশেষের কোঠায় কোন-কিছুকে ধরতেন না। নামবাদিগণ (Nominalist) সাধারণকে মান্‌তেন না; বিশেষের সমষ্টিই সাধারণ; এক একটি পৃথক্ সত্তাই আসল পদার্থ। দ্বৈতবাদিগণ (conceptualist) এই দুই মতবাদের মিলন-সাধন করেছেন। কোন জিনিসের Concept (কল্পনা বা ধারণা) চিন্তার গোড়ার জিনিস। কল্পনা একটি ছাঁদ বা প্যাটার্ন্।

ইন্দ্রিয়-বাহিত প্রক্রিয়া থেকে মন চলে নানা ছাঁদে। এই প্যাটার্ণ্ সকলের অর্থাৎ সকল মনের এক নয়। একটি ফুল সাধারণ লোকের কাছে শুধু ফুল ; কবির কাছে কত গভীর রহস্যের, কত শতকল্পনার কল্পলোক্। তাহ'লে বোঝা গেল, মনের দু'টি ধর্ম ; একটি বিশ্লেষণ, অপরটি সংযোজন। দু'টি ধর্মই একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। কল্পনা বা চিন্তনে আমরা জীব বা বস্তুমাত্রের যে ধারণা করি, তাতে বিশ্লেষণ আনি ; পৃথক্ জীব বা বস্তুকে পৃথক্ দেখি। আবার, তাদের সাধারণ-ধর্মী সত্তা বা অস্তিত্বকে স্বীকার করি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই ধারণার ব্যাপারে ভাষা অতি বড় সহায়। ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীও এক প্রকারের ভাষা। আদিম মানবের মন অঙ্গভঙ্গীর ভাষাতেই ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ কর্‌ত। সভ্য মানুষ বের কর্‌ল বর্ণমালা, তার পর অফুরন্ত শব্দ-সম্পৎ। ভাষা ভাবের বাহন। ভাষার সাহায্যেই আমাদের চিন্তা-রাশি। যে-কোন দেখা, শোনা বা ছোঁওয়া জিনিসকে আমরা একটা নাম দিই। পরে, ঐ নামটাকে আশ্রয় ক'রে চিন্তনকে দানা বাঁধ্‌তে দিই। কিন্তু চিন্তনের সব-খানি ভাষার বাঁধন বাঁধ্‌তে পারি না। চিন্তা-স্রোত সমুদ্র-স্রোতের মত ভেসে চলে ; ভাষা বা শব্দ তার মাঝে মাঝে হিমবাহের মত দোল্ খেয়ে চলে।*

যাই হোক্, আমরা ভাষা দিয়ে ধারণা করি কোন বস্তুর, সম্পর্কের অথবা গুণের। ঘোড়া, টুপি, টেবিল্, চেয়ার—এই কথাগুলি চোখে-

* "The cognitive field may, then, be compared to an ocean studded with ice-bergs. Only dotted here and there has the thought frozen into verbo-conceptual rigidity." Spearman, as quoted by Ross.

দেখা জীব বা বস্তুর ধারণা-সূচক শব্দ। সাধুতা, শুভ্রতা, স্বাদুতা প্রভৃতি কথা কতকগুলি গুণের ধারণা-সূচক শব্দ। উচ্চতর, হীনতর, বৃহত্তর প্রভৃতি শব্দ কতকগুলি সম্পর্কের তারতম্যের কল্পনা-সূচক। এখানে কল্পনার অর্থ ধারণা (concept)। শিশুরা ক্রমশঃ দৃশ্য বস্তুর ধারণা থেকে কল্পিত বস্তু, গুণ এবং সম্পর্কের তারতম্যের ধারণা করে। শিশুর শিক্ষাদাতার বড় কাজ—তার ধারণাশক্তিকে দৃশ্য বস্তুর আওতা থেকে অদৃশ্য ভাবের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া। শিশু করবে আবিষ্কার, শিক্ষক দিবেন নাম।

চিন্তনের পর আসে বিচার। যখনই দুইটি ভাব বা চিন্তার পরস্পর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে সম্পর্ক দ্বন্দ্ব ও ব্যতিরেক, যারই হোক্ না কেন, তখনই আসে বিচার-বোধ। বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ, অনেক সময়ে, আমাদের অজ্ঞাতসারে হতে থাকে। বিচার-বোধ যত তীক্ষ্ণ ও মার্জিত হয়, আমাদের চিন্তাশক্তি তত উন্নত হয়।

বিচারের অপর নাম যুক্তি-প্রয়োগ। শিক্ষা-বিশারদ * ডিউই সাহেব (Dewey) যুক্তির পাঁচটি ধাপ ঠিক্ করেছেন। প্রথমে কোন সমস্যার উপস্থিতি। তার পর পরীক্ষা। তৃতীয় স্তরে সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন। চতুর্থতঃ, একটি সমাধানকে গ্রহণ ক'রে বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা-মূলক আলোচন। সর্বশেষে একটি পরীক্ষিত সমাধানের গ্রহণ বা বর্জন। যে কোন বিষয়ে হো'ক্, এই পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করলে বিচার, যুক্তি বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ হয়।

* Dewey—How we think (Harrap)

Reasoning বা যুক্তিকে বলা যায় কোন সমস্যা বা প্রশ্নের কল্পিত সমাধান। বাস্তবের সঙ্গে খাপ্ খায়, এমন সম্পর্ক ও তর্কধারা তাতে টেনে আনা হয়। মানবেতর প্রাণী এবং মানব-শিশু যুক্তি জানে না ; তারা চলে পরীক্ষা ও ভুলের সিঁড়িতে সিঁড়িতে। তাদের আশ্রয় অনুভূতি। একটা কিছু ধরে, আবার পরক্ষণে সেটাকে ভ্রান্তি মনে ক'রে ছেড়ে দেয়। আবার আর একটা-কিছু ধ'রে নেয়। এই হচ্ছে তাদের নেতি-বিচার। কিন্তু পূর্ণ-বয়স্কেরা তা করে না। তাদের নেতি-বাদ কল্পিত অবস্থার পারম্পর্যে। কথা প্রায় একই, কেবল স্তর-ভেদ মাত্র। কল্পিত অবস্থা ও অবস্থানের মধ্যে বিজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।

কল্পনাকে যুক্তির শিকলে বাঁধ্তে দিতে হবে শিশুদের। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও তজ্জাত শিক্ষা নূতন যুগের অবদান। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে ডক্টর মণ্টেসরি তার পরীক্ষণ আরম্ভ করেন। ফ্রয়েডের মত তিনিও মনশ্চিকিৎসা আরম্ভ ক'রেছিলেন, পরে শিশুর মনশ্চিকিৎসায় মেতে গেলেন। শিশুর বাস্তবরাজ্য রফা কর্বে তার কল্পনা-রাজ্যের সাথে। তাই তাঁর শিক্ষা-প্রণালীতে উদ্ভাবিত হয়েছিল নূতন নূতন উপকরণ। তাঁর প্রণালীর সার কথা বের ক'রেছেন রস্ সাহেব। "Let fact correct fancy and fancy correct fact."—এর অর্থ, বাস্তব ও কল্পনা পরস্পরের ত্রুটি সংশোধন ক'রে শিশুকে এগিয়ে নেবে তার স্বাধীন সত্তা-বোধে। মুক্তির মাঝে শাসন (free discipline) তাঁর পদ্ধতি। মণ্টেসরির পরীক্ষণের পঞ্চাশ বছর আগে ফ্রান্স্ দেশে Edouard Seguin বিকৃত-মস্তিষ্কের শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রেছিলেন। ১৯০৭ সালে San

Lorenzo নামক ইটালীর অন্তর্গত সহরের নোংরা বস্তিতে তিনি তাঁর প্রথম উল্লেখ-যোগ্য বিদ্যালয় বা পরীক্ষাগারের কাজ আরম্ভ করেন। সেখানে, বিকৃত-মস্তিষ্ক নয়, সুস্থ-মন শিশুদের নিয়ে শিক্ষণ-পরীক্ষা সুরু করেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েরা অসাধারণ উন্নতির পরিচয় দেয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রচার করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—Metodo della Pedagogia Scientifica (Scientific method of Teaching)। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর auto-education বা স্ব-শিক্ষার যুগান্তরকারী পদ্ধতি প্রচারিত হ'ল। The Times Educational Supplement-এর এক সংখ্যায় আছে—"Her method is empirical, being built up on the observed results of actual teaching rather than conceived as a philosophical entity and imposed from above. Its two main principles are non-interference with the child's freedom and individuality and the use of sensory training in the earliest stages of education. Her claims to originality lie in the application of sensory training to normal children, in the working out of a systematic scheme, stage by stage, and in the provision of a set of didactic materials for handwork." [May 9, 1952.]

—এর তাৎপর্য পূর্বেই লেখা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে-মেয়েদের স্বচ্ছন্দ পরিবেশে—চিন্তন, বিচার এবং কর্মশক্তির উন্মেষ। Watson-এর Behaviourism ডক্টর মণ্টেসরীর আবিষ্কৃত তত্ত্বের নব-তর ভাষ্য।

চরিত্র-গঠন

শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য চরিত্র-গঠন। চরিত্রের বিকাশ ও প্রমাণ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে। ইচ্ছার উৎস—এষণা। এষণা গ'ড়ে ওঠে মনোগত ভাবের ওপর। এই ভাবকে ইংরেজিতে বলা হয় sentiment। এ জিনিসটি স্থায়ী। কিন্তু এই স্থায়ী জিনিসটি কতকগুলি অস্থায়ী প্রবৃত্তির ও অভ্যাসের ফল। অস্থায়ী প্রবৃত্তিটি এক রকমের অভিজ্ঞতা। শিশু যখন তার অভিপ্রায় মত কাজ কর্‌তে পারে না কিংবা বাধা পায়, তখন জন্মে তার ক্রোধ-প্রবৃত্তি, যা একটি emotion, অর্থাৎ জন্ম-গত প্রবৃত্তি-জাত বস্তু। প্রেমিক প্রেম-বিতরণে প্রতিহত হ'লে ক্রুদ্ধ হয়। সে ক্রোধ জন্মে একটি sentiment থেকে।

Sentiment প্রকাশের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী আছে। প্রকাশ-ভঙ্গীর অভাব ঘট্‌লে sentiment, অর্থাৎ স্থায়ী মনোভাব বিশীর্ণ ও পরে বিলুপ্ত হ'তে পারে। যে লোক পারিবারিক জীবনের উপযোগী মনোভাব এবং ঐরূপ মনোভাবের সুযোগ বা আওতা থেকে বঞ্চিত হয়, তার পরিবার ব'লে কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা-বোধ নষ্ট হয়। এমনি ক'রে লোকের ধর্ম-বোধ, দেশাত্ম-বোধ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হ'তে থাকে। সে হয়ত হঠাৎ কোন উচ্ছ্বাস দেখাতে পারে, কিন্তু স্থায়ী মনোবৃত্তি বা তৎ-সূচক কোন ক্রিয়া তার দ্বারা সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং অভ্যাসের ফলে পরিচিত ও পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়ে এক এক প্রকারের sentiment প্রাবল্য লাভ করে।

শিশুর স্বভাবজ প্রবৃত্তিগুলিকে শৃঙ্খলিত ক'রে এক একটি sentiment প্রাধান্য লাভ করে। আবার, sentiment-গুলি স্তরভেদে শ্রেণীবদ্ধ হয় মনের মধ্যে। একটি sentiment প্রবল হ'লে অপরটি দেবে যায়। শিশুকাল থেকে প্রৌঢ়ত্ব অবধি, মানুষের জীবনে, এক একটি sentiment প্রবল হ'য়ে তার সমস্ত কর্ম ও চিন্তাকে চালিত করে। কোন ছেলে যদি একখানা বাই-সাইকেল কেনে, তাহ'লে দিন-রাত কি খাওয়া, কি বেড়ানো, কি পড়শুনা, সব সময়ে ঐ সাইকেলকে ঘিরে থাকে তার মনটা। আবার, বয়স বাড়্লে তার sentiment হয়ত অন্য কোন বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে ক্রিয়া-পরায়ণ হয়। হয়ত তখন তার দেশভ্রমণ-স্পৃহা জাগে। দিবা-রাত্রি সেই ভাবনাই ভাবে। হয় কোন উচ্চ আদর্শ বা আকাঙ্ক্ষা, না হয় কোন খেয়াল (hobby) তার তৎকালীন জীবনের একমাত্র কাম্য ও করণীয় বস্তু হ'য়ে পড়ে। সন্তানের প্রতি স্নেহ হয়ত পরিবর্তিত হ'য়ে পরিবার-প্রীতিতে উন্নীত হয়, পরে আবার দেশ-প্রীতি ও মানব-প্রীতি পরিপুষ্ট হ'য়ে সন্তান-বাৎসল্যকে তলিয়ে দেয়। কিন্তু একাধিক sentiment-এর দ্বন্দ্ব বা সংঘাত আরম্ভ হ'লে তার পরিণাম হয় দুঃখ। আমরা সাধারণতঃ দেখি আত্ম-বোধ বা আত্ম-প্রত্যয় মানুষের প্রবলতম sentiment। নিজ বা নিজ পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে আত্ম-বোধ জাগ্রত হয়। শিশুর আত্ম-বোধ কি ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, তার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। তাতে আমরা দেখেছি, শিশুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (voluntary) ক্রিয়া দিয়েই তার মনের স্বরূপ প্রকাশ পায়; চাপিয়ে-দেওয়া কাজ থেকে শিশু-মনকে ধরা যায় না। স্বেচ্ছামূলক কাজের পরীক্ষা তখনই হয়,

যখন শিশু দু'টি প্রচণ্ড ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার অভিঘাতে পড়ে। শিশুর আমিত্ব-বোধ তখনই উদ্বুদ্ধ হয়।—আমি এইটে করবো, কি করবো না—শিশু ভাবতে থাকে; তার "আমি-"টা এখানে বড় এজেন্ট্। আত্মার আস্বাদ তখন বালক সম্ভোগ করে। এখানেই আমরা তার চরিত্র-বিকাশের প্রথম আলোক-রশ্মি দেখতে পাই।

আত্ম-বোধ থেকে কর্মের উদ্ভব। কর্মের দু'টি নাড়ী, একটি মন, আর একটি দেহ। মনের সাথে দেহ সক্রিয় হয়। সৈন্যেরা যখন রাইট্-লেফট্ ক'রে চল্তে থাকে, তখন আমাদের পা আপনা থেকে নাচ্তে চায়। এখানে দেহের প্রাধান্য। আবার, দু'-তিন রকমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব যখন মনকে দোলা দেয়, তখন মনটা যেন করাতের মত একবার এদিকে, আর একবার অন্যদিকে ছোটে। বেশ দীর্ঘকাল ধ'রে এই দোলায়িত মানসক্রিয়া চল্তে থাকে। পরে মন একটিকে বাছাই ক'রে নেয়। এই বাছাই করার ব্যাপারে খুব বেশী বিচার আমরা সব সময়ে করি না। গা ছেড়ে দিয়ে চলি। স্রোতে ভাসমান বস্তুর মত মনকে চল্তে দেই। কিন্তু যখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বহু বাধাকে অতিক্রম ক'রে মনকে নির্ধারিত আদর্শের পেছনে ছুটতে দেই, তখন চরিত্র-বল প্রকাশ করি। তখন বিপদ্, লজ্জা, অপমান—সব তুচ্ছ করি। তখন মনের সৃজনী-শক্তি আমাদের কর্মকে বিধৃত ক'রে রাখে। তখন যত বেশী বাধা আসে, তত বেশী আত্ম-শক্তি জাগে। বাধা যত গুরুতর হয়, আত্ম-শক্তি তত প্রবল হয়। এ ক্ষেত্রে আত্ম-সংযম আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আত্ম-সংযমে আমাদের চরিত্র-বল প্রকাশ পায়।

চরিত্রের উপাদান অনেক। বংশানুবৃত্তি, স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি, আবেষ্টন-জাত সংশুদ্ধি, নব নব পরিস্থিতিতে নব-তর শক্তি-বৃদ্ধি এবং একটি সুদৃঢ় ও সুগভীর sentiment-এর মধ্যে অন্য সব sentiment-এর নিমজ্জন—মানুষের চরিত্রের উপাদান। শিক্ষকের প্রধান কাজ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র-গঠনে সহায়তা করা।

চরিত্র দ্বিবিধ—ব্যক্তিগত এবং জাতিগত। জাতি বা সমষ্টিগত চরিত্রের উন্নতি অবনতি জাতি বা সমষ্টির অন্তর্ভূত ব্যক্তির চরিত্রের উন্নতি বা অবনতির উপর নির্ভর করে। আমাদের জাতীয় চরিত্র কোন্ পথে চলিতেছে, সে সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমাদের জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে; ছেলে-মেয়েরা আগেকার চেয়ে অনেকটা বেশী নির্ভীক হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সে নির্ভীকতার মূলে শিক্ষা-ব্রতী এবং শিক্ষা-ব্যবসায়ীগণের দান কতটুকু, তার পরিমাপ করা দরকার। আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দায়িত্ব আছে, কিন্তু দায়িত্ব-বোধ কতখানি জাগ্রত, তার প্রমাণ শুধু পরীক্ষাপাশের তালিকায় কিংবা শিক্ষক-সম্মেলনের সুদীর্ঘ প্রস্তাবাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। প্রমাণ পাওয়া যেত, যদি আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবসায়িগণ শুধু ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্রোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং উপায় উদ্ভাবনের জন্যে স্থানে স্থানে সম্মিলিত হতেন। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে সেণ্ট্ এল্‌ফিন স্কুলে প্রায় ৫০ জন খ্রীষ্টান শিক্ষা-ব্রতী শুধু শিক্ষার্থিগণের চরিত্র-বিকাশ সম্বন্ধে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। ইংল্যাণ্ডের বহু হেড্-মাষ্টার, হেড্-মিস্ট্রেস্, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক—এই অনুষ্ঠানে

যোগদান করেছেন। একজন প্রধান শিক্ষক, মিঃ জন্ আউন্‌ষ্টেড্, ছেলেদের চরিত্র অপেক্ষা তাদের ব্যক্তিত্বের মূল্য দেন বেশী। 'চরিত্র' কথাটির সংজ্ঞা স্থির করা, তাঁর মতে, এক রকম অসাধ্য। অধ্যাপক বার্ণেশ্ বলেন, ছেলেমেয়েদের বোঝা'তে হবে—

"সকলের তরে সকলে আমরা—
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন এই, শিক্ষক বা ছাত্র যা বলেন বা করেন, তার প্রভাব অন্যের ওপর কতখানি বিস্তৃত হয় তার হিসেব করা। কেননা একথা ঠিক্ যে আমরা কেউ কাউকে ছাড়া নই।

উক্ত সম্মেলনে দু'টি দল হয়। একদল বলেন, ছাত্র বা ছাত্রী নিজের ছন্দে জীবন-পথে চল্‌বে ; শিক্ষক থাক্‌বেন শুধু পরিদর্শক হিসেবে—অন্তরালে। এঁরা মনে করেন, মানুষ মাত্রেই ভাল, শুধু যাতে সে সকল বাধা কাটিয়ে বিকশিত হ'তে পারে ও নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, শিক্ষক তা দেখ্‌বেন। সুতরাং চরিত্র-গঠনই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আর একদল বিশ্বাস করেন, মানুষের সাধুতায় বিশ্বাস নেই, সে আসলে নিতান্ত মন্দ ; সুতরাং শিক্ষক সজ্ঞানে এবং সচেতন ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র-উন্নয়নের ব্যবস্থা করবেন। এ কথা ঠিক্, এই গঠন-কার্য থেকে শিক্ষক অব্যাহতি পান না। তাঁর প্রধান অবলম্বন ব্যক্তিত্ব ; বক্তৃতায় তার প্রকাশ হয় না ; হয় আচরণে। "আপনি আচরি' ধর্ম পরেরে শিখাই।"—এই ভারতীয় বৈষ্ণব-তত্ত্ব আজ বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে সুদূর ইংলণ্ডে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের 'টাইম্‌স্' পত্রিকার শিক্ষা-বিষয়ক উপ-পত্রে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে

(২৫শে এপ্রিল, ১৯৫২)—নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"Character remains difficult to define, and the sum of a good character *in these days* would provide a subject for long debate. One suspects, however, that it is a subject, although the most important in education, *which is at present somewhat neglected.* That is why debate upon it might be most healthy and fruitful." উন্নত দেশেও এই অবহেলা! আমাদের শিক্ষা-ব্রতী অবহিত হোন্।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক জিনিস হ'লেও তফাৎ আছে। প্রচলিত ভাষায় আমরা মানুষের চরিত্রে সু ও কু দুই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু ব্যক্তিত্বে সু এবং কু দেখ্‌তে পাই না। আমরা বলি, অমুক লোকটির ব্যক্তিত্ব আছে, অমুকের নেই। 'ব্যক্তিত্ব' কথাটির সংজ্ঞা-নির্দেশ করা কঠিন। ব্যক্তিত্ব ব্যাপক জিনিস। চেহারার জৌলুস্, দেহের গঠন, জ্ঞান ও বহুদর্শিতা, মেধা, মেজাজ এবং অভ্যাস, মর্মগত বিশ্বাস ও চরিত্র—সব কিছু মি'লে গ'ড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্ব যার আছে, তার সবচেয়ে বড় জিনিস আত্ম-প্রত্যয়। শিশুর আত্ম-বোধ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পূর্ণবয়স্কের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। নিন্দা, প্রশংসা, সফলতা, বিফলতা—এ সবের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজকে দৃশ্যমান বস্তুর মত প্রতিনিয়ত পরীক্ষা ক'রে চলে,—আমরা অন্যকে যেমন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখি, তেম্‌নি যে ব্যক্তি নিজকে সর্বদা সতর্ক অবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করে, সেই

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে, বুঝ্‌তে হবে। সমাজ-জীবনের ভিত্তিতেই ব্যক্তিত্বের গঠন হয়; নিঃসঙ্গতায় ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না। কেননা, অন্যের মনের সঙ্গে নিজের মনের আনা-গোনা দরকার। নূতন নূতন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বের নব নব বিকাশ হয়। অবস্থার চাপে প'ড়ে যখন আমরা কোন কিছু কর্‌তে বাধ্য হই, তখন ব্যক্তিত্ব জাগে না; যখন আমরা সজ্ঞানে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'য়ে নিজের মত ও পথ নির্দিষ্ট করি, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। আবার, যার জীবনে কোন লক্ষ্য বা আদর্শ নেই, তার ব্যক্তিত্ব ফুট্‌তে পারে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, ব্যক্তিত্ব একটি সামগ্রিক বস্তু, জীব-দেহে জীবনী-শক্তির মত। চারাগাছটি যেমন বড় হয়ে প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা-বহুল বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি শিশুর আত্মবোধ মনের রস এবং বিশ্বের রশ্মি গ্রহণ ক'রে ব্যক্তিত্বে পরিপুষ্ট হয়। ঘরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ-স্থাপন, অর্থাৎ নিজের সঙ্গে অপরের সঙ্গত সম্পর্ক—ব্যক্তিত্বের প্রধান পরিচয়। আবার, নিজের নানা রকম কাজ ও চিন্তার মধ্যে যোগ-সূত্র-স্থাপন ব্যক্তিত্বেরই কাজ। ব্যক্তিত্ব মানুষকে অভিভূত করে। কথা ব'লে এবং কখনো না ব'লে, কাজ ক'রে এবং করিয়ে, ইঙ্গিতে এবং প্রকাশ্য নির্দেশে যিনি অন্যের মনে দাগ কাট্‌তে পারেন, তিনি পুরুষই হোন্ আর নারী হোন্, তাঁর ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশিত হয়। বড় মজা এই, দুশ্চরিত্র হয়েও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকমের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর—কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান যুগে।

মার্কিন দেশের বিজ্ঞানী জেম্‌স্ সাহেব বলেন, মানুষ দু'রকমের;

নরম-হৃদয় এবং কঠোর-হৃদয়। প্রথমোক্ত দল আদর্শ-বাদী; শেষোক্ত দল বস্তু-বাদী।

জার্মান পণ্ডিত য়ুং (Jung) তিন শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত ক'রেছেন। যারা **অন্তর্মুখীন** (introvert), তারা সন্ত্রস্ত এবং সাবধান; তারা কোন কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিথিল। তারা বন্ধু-মহলে অগ্রণী হয় না। তারা ধৈর্যশীল। যারা **বহির্মুখীন** (extrovert), তারা বাইরের জগতের খবর নেয় বেশী। তারা প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সাহসী। তারা আবেগ-পরায়ণ। তারা সমাজপ্রিয় এবং বন্ধু-বান্ধবের অনুরাগী। তাদের ধৈর্য কম। এই দুই শ্রেণীর **মধ্যপন্থী** যারা তাদের ইংরেজি নাম—*ambivert*।

ক্রেশ্‌মার (Kretschmer) নামক আর একজন জার্মান পণ্ডিত চার শ্রেণীর মনুষ্য-বিভাগ করতে চেয়েছেন। দেহ-গঠনের ভিত্তিতে তাঁর মনোবিভাগের রীতি। যারা বেশ মোটা-সোটা, নাদুশ্-নুদুশ্—তারা বেশ মিশুক আর সরল। যারা পাতলা ছিপ্-ছিপে, তারা প্রায়ই হয় খিট্-খিটে, বদ্ মেজাজী; তারা লোকের সাথে বেশী মেশে না। যারা বেশী বলিষ্ঠ, তারা গোঁয়াড়-গোবিন্দ। আবার, এদের সব ভাবের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে আর এক জাতের মানুষ। আর একজন মনীষী, যাঁর নাম Spranger, শ্রেণী-বিভাগ ক'রেছেন অন্য রকমে। ভাবুকশ্রেণীর লোকবিজ্ঞানবিদ্, দার্শনিক অথবা আবিষ্কর্তা হয়। সৌখীন শ্রেণীর লোক কবি ও শিল্পী হয়। হিসাবী লোক ব্যবসায়ী বা শিল্প-পতি হয়। রাজনীতিজ্ঞ লোক শক্তিমদে মত্ত থাকে। ধর্ম-পরায়ণ লোক পরপারের জন্যে ব্যাকুল; তারা হয় সাধু, সন্ত, যাজক ও মরমী। সামাজিক লোক হয় সংস্কারক এবং সেবক।

শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। খণ্ডিত প্রচেষ্টায় তা হয় না, কেননা ব্যক্তিত্ব একটি সমগ্র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ জিনিস। সমস্ত দোষ-গুণ মিলিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার শক্তি-সামর্থের যেখানে সামঞ্জস্য থাকে, সেখানে ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয়। জ্ঞান, কর্ম এবং প্রবৃত্তির সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ আন্‌তে গেলে চাই সেই রকমের পরিপূর্ণ শিক্ষা, গৃহেই হোক্, আর বিদ্যালয়েই হোক্। সমাজ-চেতনা এ শিক্ষার অ, আ, ক, খ। এ রকমের সামাজিকতা-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয় গৃহে, পুষ্ট ও পল্লবিত হয় বিদ্যায়তনে। সেইজন্যে আজকালকার বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কেবল পুস্তক-গত জ্ঞান যথেষ্ট নয়; প্রতিযোগিতার সঙ্গে সহযোগিতার সমন্বয়ে ক্রীড়া-কৌতুক, স্কাউটিং, ব্রতচারী অনুষ্ঠান, সমাজ-সেবা-সঙ্ঘ, সমবায় ভাণ্ডার, স্কুল ব্যাঙ্ক্, আর্ট-ক্লাব্, যৌথ অভিযান প্রভৃতি নানা দিকে ছেলেমেয়েদের বিবিধ বৃত্তির অনুশীলন কর্‌তে হয়। স্কুল তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিচ্ছায়া নয়, জীবনাভিনয়ের মহড়া বা রিহার্সাল নয়; স্কুল তাদের কাছে বাস্তব জগৎ, রূপে রসে ভরপূর, রঙে ঝল্‌মল্, আশার রসায়নে সজীব। সুতরাং স্কুলের শিক্ষককে হ'তে হবে সেই রসায়নের বাহক ও ধারক। ছেলে-মেয়েদের বিবিধ রকমের জ্ঞান, চিন্তা ও ক্রিয়ার বেণী-বন্ধন করাবেন তিনি, তবেই হবে integration of personality—(ব্যক্তিত্বের সমষ্টিকরণ)।

এই সমষ্টিকরণ অর্থাৎ একীকরণের অভাব এবং ত্রুটি ঘট্‌লে দেখা যায়, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ হয় মুখচোরা, কেউ হয় শারীরিক ত্রুটির জন্যে দুর্বলচিত্ত, কেউ বা হয় অতিরিক্ত ভাবালু,

দিবা-স্বপ্নে মশ্‌গুল। আবার দেখা যায়, কেউ বা প্রবৃত্তির উন্নয়নে লেগে যায়—যেমন, একটি ছেলে হয়ত বেশী কোথাও ভ্রমণ করে নি, সে যদি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প'ড়ে নিজের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করে, তবে মন্দ কি হয়? বরঞ্চ ভালই হয়। সে তার ইচ্ছাশক্তির উন্নতি-সাধন করে। কেউ বা নিজের দোষ-ত্রুটি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। গরীব ছেলে পরীক্ষকের দোষ ধরে; দর্‌জি কাপড়ের ত্রুটি ধরে; নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা হয়।—এ সব ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের একীকরণে ত্রুটি। স্কুলে এই ত্রুটিগুলিকে যথাসম্ভব ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে ছেলেমেয়েদের। শিক্ষক হবেন ত্রুটি-সংশোধনের প্রহরী।

ভারতীয় জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে নর-নারীর আকৃতি ও প্রকৃতির তারতম্য বিশেষ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে। ক্রেশ্‌মারের কত শতাব্দী আগে আমরা শুনেছি, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রাধান্য অনুসারে নর-নারীর দেহ ও মনের বিবিধ পরিবর্তন ঘটে। বাত-প্রধান ব্যক্তি কৃশ এবং অল্প-কেশ হয়। তাদের হাত-পায়ের হাড়গুলো বেরিয়ে থাকে, অর্থাৎ ক্ষীণ-মাংস হয়। নিদ্রা অল্প হয়, বহুভাষী হয় এবং স্বপ্নে আকাশচারী হয়। পিত্ত-প্রধান ব্যক্তি গৌরবর্ণ হয়; তার কেশ অকালপক্ক এবং নেত্র তাম্রবর্ণ হয়। এরূপ লোক বহুভোগী, ক্রোধী ও বুদ্ধিমান্‌ হয়। স্বপ্নকালে অন্তরীক্ষে জ্যোতিষ্ক দর্শন করে। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি স্থূলদেহ, কৃষ্ণকেশ এবং মহাবলশালী হয়। স্বপ্নে প্রায়শঃ জলাশয় দর্শন করে।† বাগ্‌ভট-কৃত গ্রন্থে দেখ্‌তে পাই, বাতপ্রধান লোক কি স্ত্রী, কি পুরুষ, শীত সহ্য কর্‌তে পারে না। এরূপ নর-নারীর ধৃতি,

† ভাবপ্রকাশঃ—পূর্বখণ্ডে প্রথমভাগ।

স্মৃতি এবং বুদ্ধি ও উদ্যম সর্বদা সক্রিয় থাকে এবং স্বভাবতঃ সৌহার্দ্য-পরায়ণ হয়। বিলাস, ভোজন, গীত, হাস্য-পরিহাস, মৃগয়া—বাতপ্রধান ব্যক্তির প্রিয়। এরূপ লোক দৃঢ়চিত্ত হয় না, জিতেন্দ্রিয় হয় না, কান্তাদয়িত অর্থাৎ স্ত্রীর প্রিয়তম হয় না, বহুসন্তানের জনক (বা জননী) হয় না। পিত্তপ্রধান লোক মানী, শূর, স্ত্রীর প্রিয়তম, মাল্য-চন্দন-মণ্ডনের অনুরাগী, সদাচারপরায়ণ, পবিত্র এবং আশ্রিতবৎসল হয়। শত্রু-বেষ্টিত হ'লেও এরূপ লোকের বিভব, সাহস, বুদ্ধি, বল ঠিক থাকে। এরা মেধাবী এবং নারীগণের অনভিমত হয়। এরা খুব দীর্ঘায়ু হয় না, এদের দৈহিক বল খুব বেশীও হয় না, খুব কমও হয় না। এরা পণ্ডিত ও ক্লেশ-ভীরু হয়। আবার, শ্লেষ্মপ্রধান লোক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, কষ্ট, ঘর্ম খুব সইতে পারে। এরা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ও সত্য-পরায়ণ হয়। এদের বর্ণ পদ্ম ও সুবর্ণের ন্যায়, এদের বাহু প্রলম্বিত, বক্ষঃস্থল এবং ললাট উচ্চ, কেশ ঘন-নীল-বর্ণ হয়। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুঠাম ও সুবিভক্ত হয়। এরা ধর্মাত্মা হয়, কখনও নিষ্ঠুর কথা বলে না, গোপনে দীর্ঘকাল বৈরভাব বহন করে, বিস্মৃতির বশীভূত হয় না, অভিযোগ-পরায়ণ হয় এবং বিনীত-স্বভাব হয়। বাল্যকালে অতিরোদনশীল অথবা খাদ্য-লোলুপ হয় না। কেউ কেউ দীর্ঘসূত্রী, বদান্য এবং হৃদয়বান্ হয়। ক্ষমাবান্, নিদ্রালু, নির্লোভ এবং কৃতজ্ঞ হয়। চরক-সংহিতায় এই গুণবিভাগের সুবিস্তৃত আলোচনা আছে, আমাদের তাতে প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধু প্রয়োজন শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অধ্যয়ন করা এবং সেই প্রকৃতির সহায়তায় প্রকৃতি জয় করতে শেখানো, যাকে আমরা পূর্বে নাম দিয়েছি sublimation

(প্রকৃতির উন্নয়ন)। তন্ত্র-শাস্ত্রে স্ত্রী-জাতির দৈহিক গঠন-ভেদে অন্তঃ-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চিত্রা, পদ্মিনী, রাক্ষসী প্রভৃতি সংজ্ঞায় স্ত্রীগণকে ভূষিত করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হ'লে শিক্ষার্থিনীর যোগ্যতা-নির্ণয়ে সজাগ হ'তে পারবেন। প্রাচীন ভারতে, বৌদ্ধ যুগে, অনূঢ়া স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম কন্যা বা কুমারী ছিল। অনূঢ়া স্ত্রী চিরকালই কুমারী। তন্ত্রের বচন অনুসারে এক থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া কুমারীর পূজার ব্যবস্থা ছিল। দেবী-পদ-বাচ্য এদের ষোলটি নাম ছিল।* একেই বলা হ'ত ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা। যে দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে স্ত্রী-জাতিকে দেখা হ'ত, তা আদর্শ-বাদ হিসেবে, অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। পতনের যুগে এই প্রথা হেয়তা ও ক্লিন্নতায় আদর্শকে নামিয়ে এনেছিল। কুমারী-পূজার সদর্থ গ্রহণ করলে আমরা বুঝতে পারবো সেই যুগ, যখন শিক্ষার মর্যাদা শুধু পুঁথি-গত না হয়ে সমাজ-দেহের রন্ধ্রগত হয়েছিল।

* একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা তু ত্রিধা মূর্তি শ্চতুর্বর্ষা তু কালিকা॥
শুভগা পঞ্চবর্ষা চ ষড়্-বর্ষা তু উমা ভবেৎ।
সপ্তভি র্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুব্জিকা॥
নবভিঃ কালসংকর্ষা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে তু রুদ্রাণী, দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী॥
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী র্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চান্নদা মতা॥
এবং ক্রমেণ সংপূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।
পুষ্পিতাপি চ সংপূজ্যা তৎপুষ্পাদানকর্মণি॥
(রুদ্রযামলে কুমারিকা-পূজা-প্রকরণ)

এই সমাজে যদি চরিত্র-গঠন না হয়, তবে হবে কোথায় ? সহশিক্ষার প্রশ্ন সেকালে উঠেছিল কিনা, প্রমাণ নেই ; কিন্তু বিদুষী নারী এবং বিলাস-বিদগ্ধ গণিকার অভাব ছিল না। সেকালের শিক্ষা-ব্রতীকে যে উচ্চগ্রাম থেকে ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়েছিল, তা বর্তমান পৃথিবীর সমাজ-ভাঙ্গা-গড়ার কম্পনে অদৃশ্যই থেকে যাবে।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক

মনোবিজ্ঞানবিৎ শিক্ষক না-ও হ'তে পারেন, কিন্তু শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান জান্‌তে হবে। কেননা তাঁর ব্রত বা ব্যবসায় যাদের নিয়ে, তাদের মনোরাজ্যের আনাচ্‌-কানাচ্‌ তাঁর খুঁজে বের কর্‌তে হবে। এই মনোরাজ্যের সন্ধান বিংশ-শতাব্দীর দান। এই শতাব্দীতে শিক্ষা-জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমতঃ দুনিয়া হয়েছে ছোট, অর্থাৎ সব মানুষ প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই হচ্ছে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে বিভেদ সংকীর্ণ হয়েছে; জাতি-গত বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিকতায় বিলীন হ'তে চলেছে। দুনিয়ার সব ছেলেমেয়েদের আমরা এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার কর্‌তে শিখেছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রণালী, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও দেশ সম্বন্ধে নানা বিভেদ সত্ত্বেও, প্রায় একই ছাঁচে পড়তে যাচ্ছে। এ জন্যে কোন দেশকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে না। এক কথায়, শিক্ষার একটি অযত্নসম্ভূত মান বা মাপ-কাঠি আপনা থেকে গ'ড়ে উঠ্‌ছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ-বিভেদ তাকে ঠেকাতে পার্‌ছে না। কিন্তু, তাই ব'লে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে কোন ব্যাঘাত ঘট্‌ছে না। বরঞ্চ, নূতন দুনিয়ার এই অনৈচ্ছিক একীকরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপে নব-তর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি সম্ভবপর হচ্ছে। স্যার জন্‌ আডাম্‌স্‌ তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান কালে শিক্ষা-গ্রহণের সম্ভাব্য সময় নিয়ে অনেক রকমের আলোচনা চল্‌ছে। তিনি ইংরেজিতে তার নাম দিয়েছেন—"Span of Education"

(শিক্ষা-কালের দৈর্ঘ্য)। প্রায় ত্রিশ বছর আগে ইংলণ্ডের শিক্ষার্থীদের বয়সের সূক্ষ্ম বিচার ক'রে তিনি দেখেছেন—নদীর উপরের সেতুর মত বয়সের কতকগুলি স্তম্ভ বা মানদণ্ড আছে। ৩, ৫, ৭, ১০, ১২-১৫, ১৬, ১৮, ২১ ও ২৪—এই গুলিই শিক্ষা-গ্রহণের বয়স। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-ধ্বনির মধ্যে যেমন একটি সবল ও একটি ক্ষীণ, উপরের বয়সগুলির মধ্যেও তেমনি—একটিতে শিক্ষা-গ্রহণ হয় বেশি, পরেরটিতে হয় কম। এ মন্তব্য অপরীক্ষিত নয়, ভূয়োদর্শনের ফল।

জীন পল্ রিক্টার বলেন, একটি ৩ বছরের ছেলে বা মেয়ে যে পরিমাণে এবং যে দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, বাকী সারা জীবনে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েও, তা লাভ করে না। সুতরাং ৩ বছরের জোর বেশী। ৫ বছর বয়সে জ্ঞানাহরণ অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে হয়। ১০ বছর বয়সে স্মৃতিশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় এবং সজ্ঘ-বোধের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ১২-১৫ যৌনবৃত্তির উন্মেষের কাল ; সুতরাং এ বয়সের প্রাধান্য প্রবল। ১৬ বছর বয়স কম জোরালো। কিন্তু ১৮ বছর শিক্ষা-সমাপ্তির বড় একটা ষ্টেশন। ১৮ বছরে লোক সাবালক হয় ; ২১ বছর তার চাইতেও বড় ষ্টেশন। কিন্তু ২৪ বছর বয়সের তুলনায় ২১ বছর নির্জীব। এইভাবে দেখা যায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ওঠা-নামার মত শিক্ষা-গ্রহণের স্পন্দনের তারতম্য শিক্ষামনোবিজ্ঞানীর অনুশীলনের ফল। পূর্বে যে Span of Education-এর কথা বলা হয়েছে, তার প্রান্তভাগে ২৪ বছর বয়সকে ধরা যায়।

ছেলে-মেয়েদের অমূল্য সময় যাতে বৃথা নষ্ট না নয়, সে জন্যে সব সভ্য দেশে শিক্ষানায়কদের উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। কলেজীয় শিক্ষা

এবং বিশেষ শিক্ষা—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশী সময় নেবে, এ নিয়ে দু' রকমের মত লোকে পোষণ করে। অনেকে মনে করেন, ২৪ বছরের ভেতরে সব রকমের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার। জীবন-যাত্রা তখন সুরু না কর্‌লে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে, দেশের সমৃদ্ধি হয় না।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিক্ষাজগতে মার্কিন মনীষী জন্‌ ডিউই মোটর-চালনায় গিয়ারের মত আমাদের চির-পোষিত ধারণায় বেগ-সঞ্চার করেছেন। তাঁর লেখা নীচের কয়েকটি ইংরেজি উক্তি অবিকল উদ্ধৃত হচ্ছে।

"Our public schools are far more democratic today than they were 50 years ago. Children receive more freedom in the class-room and are permitted to take a greater part in school activities than they were at the turn of the century. Basically, the gap existing between the progressive and traditional school has narrowed considerably in recent years."

চিরাচরিত বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষার্থীরা বড় ছিল না; বড় ছিল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি। কিন্তু গতি-ধর্মী বিদ্যাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সমগ্র মনকে অধিকার ক'রে আছে। ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে, জীর্ণ সংস্কার নূতন প্রাণ-রসে সবুজ হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা শুধু প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে চল্‌ছে না, তারা বিদ্যালয়ে নবতর জীবন যাপন কচ্ছে এবং বিদ্যালয়ও তাদের নিয়ে আশ্রম-ধর্মী হ'তে চলেছে।

"এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা" সেইজন্যে, একস্থানে লিখেছে, জন্ ডিউইর অর্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী সাধনার ফলে এখানকার স্কুলগুলি প্রস্তুতির ক্ষেত্র না হ'য়ে জীবনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।†

সুতরাং স্কুলে ছেলে-মেয়েরা বাঁচলে স্কুলও বাঁচ্‌তে পার্‌বে; নইলে আবার তা পুরাতন দানবের ক্রীড়াভূমি অথবা প্রাসাদে পরিণত হবে। শিক্ষক এ জীবনের আস্বাদ একবার পেলে দৈত্যের দুয়ারে হানা দিতে পারবেন। দৈতটি কে?

এই দৈত্য ছিল প্রায় সব দেশে একটি নির্মম শিশু-চাপল্য-ধ্বংসী দণ্ড-ধারী বিধাতা, যার কঠোর অনুশাসন শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে পিণ্ডাকারে মথিত কর্‌তো এবং তার হৃদয়-ধর্মকে অন্ধ-কারাগারে আবদ্ধ কর্‌তো। ডেভিড্ কপারফিল্ডের মিষ্টার ক্রীক্‌ল্ এবং অপুর পাঠশালার গুরু-মশাই—এই দৈত্যপুরীর লোক, যদিও স্থানিক ও সামাজিক সংস্কারের বিভেদ সুস্পষ্ট।

শিশু-জীবনের আস্বাদ শিক্ষক পাবেন তাঁর বীক্ষণাগারে অর্থাৎ শিশুর শ্রেণীতে বা শিশু-মহলে। দৈত্য বা দানবের ছায়া অপসারিত হ'লে তিনি দেখ্‌বেন, কি কৌশলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষুদে মানুষের দেহ, মন, মাথা ও হৃদয়-ধর্ম; সমাজ-জীবনের স্তর-বিন্যাস হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সাথে—শুক-কীটের রূপান্তরের মত—পতঙ্গের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মত তাতে রং ধ'রে গেছে আপনা থেকে বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব কৌশলে।

† It was largely due to his teaching that "the centre of gravity shifted from the subject-matter of instruction to the child to be taught. As a consequence, the school began to change from a place where children *prepare for life* to a place where children *live.*"

[১৯৫৩, মে মাসের 'Modern Review' হইতে উদ্ধৃত।]

প্রাক্-স্কুল শিক্ষার মহড়া সোভিয়েট্ ও মার্কিন দেশে খুব চল্‌ছে। ছ' বছরের পূর্বে শিশুদের রুচি-নির্ণয়ে এ শিক্ষার মূল্য। কত রকমের খেলা-ধূলার আয়োজন করা হয়; যার যেদিকে ঝোঁক, ভবিষ্যতে তার সেই রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র; অভিভাবক তাতে সায় দিতে বাধ্য হন। এই সকল নার্সারি স্কুলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, মেয়ে-শিক্ষকের প্রাধান্য। ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শতকরা পঞ্চাশের বেশী মহিলা-শিক্ষক কাজ করেন। তাঁদের স্নেহ-সিক্ত শাসনে ছেলে ও মেয়েরা এক যোগে তৈরী হয়। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মহিলা-শিক্ষকের আবশ্যকতা কমে যাচ্ছে। একদল লোক বলেন, মেয়েদের কোমলতা ছেলেদের পৌরুষকে পল্লবিত হ'তে দেয় না। * যে বয়সে ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে, সে বয়সে তাদের ওপরে পুরুষ-মানুষ দরকার, শিক্ষাদানের জন্যে ততটা নয়, যতটা তাদেরকে গ'ড়ে-পিটে তোলার জন্যে। আমাদের দেশে এ প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের দেশের নূতন গুরুর দল নূতন শিক্ষা লাভ ক'রে নূতন বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌তে শিখুন। শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা কতদিনে আশানুরূপ হবে, সেইটেই বড় সমস্যা। নিরক্ষরতার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল্‌তে হ'লে নূতন শক্তি সংগ্রহ কর্‌তে হবে।

* "Women teachers are greatly in the majority : indeed the men would almost seem to be quietly passing out of this grade of work. Many people regret this, as they think boys at the troublesome age at which they finish the elementary stage at present *need a man over them, not so much to teach them as to lick them into shape.*"

["Modern Developments in Educational Practice"—Sir John Adams. Page 304]

আমাদের দেশে বয়স্কদের শিক্ষার প্রশ্ন সব চেয়ে প্রবল। শুধু রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নয়, সংস্কৃতি-ধারা বজায় রাখার জন্যই বয়স্কদের মনোরাজ্যে আলোক-পাত প্রয়োজন। যুগ-ধর্মের অভিঘাতে মানুষের মনন-ধর্মের একীকরণ—স্ত্রী, পুরুষ সকলের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং নূতনের আস্বাদ ভারতের প্রত্যেকটি নর-নারীর পক্ষে সুলভ ও স্বাভাবিক হ'তে চলেছে। কিন্তু পুরাতনকে ভুল্‌লে চল্‌বে না। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হ'লে বয়স্কদের কাছে পরিবেশন কর্‌তে হবে রামায়ণ-মহাভারতের, বৌদ্ধ জাতকের কথা ও কাহিনী, ভারত-ইতিহাসের বিবর্তন, শিল্প-কলার বৈশিষ্ট্য, বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে বহুকালের যোগাযোগ, কালচক্রে ইউরোপের প্রাধান্য, সেই সঙ্গে মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সম্পর্ক, মার্কিন মুলুকের বার্তা এবং সোভিয়েট্‌ শাসন-তন্ত্রের খবর। বয়স্কদের জান্‌তে হবে মন্ত্রের মহিমা এবং যন্ত্র-যুগের কল্লোল। পূর্ব ও পশ্চিম—দুই দরজাই খু'লে দিতে হবে ভারতের জন-গণের নয়ন-সমক্ষে।

বয়স্কদের শিক্ষার অপর অর্থ সমাজ-শিক্ষা (Social Education)। যন্ত্র-সঙ্গীত, কীর্তন, কথকতা, গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুক, পাঠাগারে গ্রন্থ-পরিচয়, আলোক-চিত্র ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে সংবাদ-পরিচিতি, চিত্রাঙ্কণ, ব্যায়াম, খেলা-ধূলা এবং নিয়মানুবর্তিতা—এ সবগুলিই অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সকলের পরিচালন কর্‌তে হ'লে চাই লোক-বল ও ধন-বল। রাষ্ট্র এ সম্বন্ধে শুধু সচেতন হ'লে চল্‌বে না, তাকে হ'তে হবে বিশেষভাবে সক্রিয়। এই সমাজ-শিক্ষার ব্যাপারেই মনো-বিজ্ঞানবিদ্ শিক্ষকের সব-চেয়ে বড় পরীক্ষা।

অনেকে বলেন, বয়স্কদের শিক্ষা এখনও পর্যন্ত অক্ষর-পরিচয়ের বেশী অগ্রসর হয় নি। আবার, অক্ষর-পরিচয়, চর্চার অভাবে, নিরক্ষরতায় পর্যবসিত হয়। তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষের লোক যত মূর্খই হোক্, তাদের সাধারণ জ্ঞান প্রখর, তাদের ধর্ম ও নীতি-জ্ঞান বেদান্ত-বাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের আচার-ব্যবহারে শত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটি দুর্জ্ঞেয় সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং তাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুল্‌তে হবে—অক্ষর-পরিচয়ের শুষ্ক আঘাতে নয়, সমবেদনা-মূলক সমাজ-পরিচিতির মৃদু টঙ্কারে। ভারত-ইউনিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাষা ও ভূগোল-ভিত্তিক পরিবেষ্টনী অনুসারে সমাজ-শিক্ষার অনুকূল প্রণালীর উদ্ভাবন কর্‌তে হবে। এই উদ্ভাবনে চাই মনোবিজ্ঞান-মূলক তথ্যানুসন্ধান, সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষক।

বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা, সহ-শিক্ষা, দুর্গত বাস্তু-ত্যাগীর শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, কর্ম-শিক্ষা—প্রতিটি বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা-প্রণালী বিশেষ আবশ্যক। এখানে বিজ্ঞান অর্থে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞান বুঝায়। প্রতিটি বিষয়ে পূর্ব-পক্ষ ও উত্তরপক্ষের বিবিধ তর্ক-বিতর্কের অবসর আছে। আলোচনাকে ক্ষীণায়তন করার উদ্দেশ্যে কেবল সামান্য কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে।

Secular state বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম-শিক্ষার উদগ্র আয়োজন নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ-সূচীর অন্তর্গত না ক'রেও extra-curriculum বিষয় হিসেবে গীতা-ধর্মের আলোচনা, চণ্ডী-তত্ত্ব, বাইবেলের উপাখ্যান ও উপদেশ, নানক-কবীর-রামদাসের সুভাষিতা-

বলী, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, রামপ্রসাদের গান, তুলসী-রামায়ণ, সাধু-সন্তদের দোঁহাবলী এবং চৈতন্য-চরিতামৃত বিতরণের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে করা যায় না, এমন নয়। বীজ সকল ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় না সত্য ; কিন্তু চেষ্টা বা প্রযত্নে দোষ কি? মুস্‌লীম ধর্মের নবীদের কাহিনী, সুফী-ধর্মের গোড়াকার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা কর্‌লে অমুসলমানদেরও অনেক কিছু জান্‌বার উপায় হয়। এই আন্তর্জাতিকতার যুগে আন্তধার্মিকতার পরিমিত অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে অপরিমিত উপকার কর্‌বে ব'লে অনেকেই অনুমান করেন। অনুষ্ঠানকে সরস, সচিত্র এবং সুশোভন কর্‌তে হ'লে শিশু-মনোবৃত্তির সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হ'তে হবে শিক্ষক-সম্প্রদায়কে। তা'হলেই সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সম্ভবপর হবে।

সহ-শিক্ষা একটি বড় সমস্যা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা অনেকের কাছে একটি বৃহৎ অন্তরায়। এর জন্যে দায়ী অনুন্নত সমাজ। গান্ধীজীর লবণ-আন্দোলনের আগে ভারতের সর্বস্তরের নারী-জাগরণ হয়েছিল কি? তখন থেকেই মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে নি কি? অসহযোগ আন্দোলনে এক একটি স্থানে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবিকা পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি কি? মেয়েদের বিবাহের বয়সের মান উর্ধ্বগতি পায় নি কি? আজ হাজারো কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কাজ ক'রে রোজগার কচ্ছেন না কি? রেল-স্টীমার যাতায়াতে আর আগেকার মত সঙ্কোচ কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। জাতীয় ভাষায় বিবিধ সংবাদপত্র প্রচলিত হওয়ার ফলে মেয়েদের মনে দেশ-বিদেশের বার্তা সংগ্রহে একটি স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ভোট-দানের

মর্যাদা, নীতি ও প্রণালী মেয়েরা পুরুষদের চাইতে কম বোঝেন না। এখানে উচ্চ-শিক্ষিত মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রাচীন-পন্থী অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অল্প-শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও অগ্রগতি বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এক কথায়, দেশের সমাজ-ব্যবস্থা অজ্ঞাতসারে নূতনের অনুসরণ কচ্ছে। এ অবস্থায়, বিশেষ দৃষ্টি ও সতর্কতার মধ্যে, মেয়েদের ও ছেলেদের সহ-শিক্ষা ঘোরতর বিপর্যয় আনবে ব'লে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা কাল-স্রোতকে গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখতে চান। সবাক্ চলচ্চিত্রের অবাক্-করা যৌন ভাব-বিলাসকে ক'টি পরিবার সর্বথা বর্জন কর্তে পেরেছে? Sexology বা যৌন-বিজ্ঞানকে ক'জন শিক্ষিত লোক স্বেচ্ছায় নিজেদের ছেলেমেয়েদের অধ্যয়ন কর্তে দিচ্ছেন? দিলে, হিত হবে না অহিত হবে, তা হল্‌ফ ক'রে বলা যায় না। বিদ্যালয়—সমাজের প্রতিচ্ছায়া মাত্র; সুতরাং বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা অনিষ্টকর ব'লে অনেকে মনে করেন না। শিক্ষককে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

পাইকারী ভাবে অজস্র নর-নারী-শিশুর দেশত্যাগ দেশ-বিভাগের উৎকট উপক্রমণিকা। ইউরোপ-খণ্ডে যুদ্ধকালে Evacuee সমস্যা সেখানকার মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বাস্তুত্যাগী বালক-বালিকাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান ইউরোপখণ্ডে যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে হয়েছে, তেমন দৃঢ়তা আমাদের দেশে দুর্লভ। আমাদের দেশে মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে ক'জন ছেলে-মেয়ে শিক্ষাশ্রমে প্রেরিত হয়? সে যাই হোক্, পুনর্বাসন দপ্তর থেকে দুর্গত বাস্তুত্যাগী বালক-বালিকাদের শিক্ষা-খাতে এখন অর্থ-ব্যয়

হচ্ছে। এটা সুলক্ষণ এবং একটি নূতন পরিস্থিতির লক্ষণ। এই পরিস্থিতিতে যাতে অনাচার, অপ-চেষ্টা এবং অর্থের অপব্যয় না হয়, সেদিকে অবহিত হবেন স্কুলের শিক্ষক; প্রধানতঃ প্রধান শিক্ষক।

বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষার ইংরেজি নাম discipline বা শৃঙ্খলা-বোধ। Blackie সাহেবের লেখা 'Self-culture', Todd সাহেবের লেখা "Students' Manual" বা স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর লেখা "সংযম-শিক্ষা"—যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তার মূল কথা 'discipline। এই discipline-এর তিন-পোয়া ভাগ গৃহে এবং একপোয়া ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়। Moral culture এখনকার দিনে, একটি জীবনপথ-বিবর্জিত অন্ধকার প্রকোষ্ঠ নয়; বর্তমান যুগে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনকে নীতি বা শৃঙ্খলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাহিরের শৃঙ্খলা আসবে একটা আভ্যন্তরীণ বোধ থেকে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Cyril Burt আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-বোধকে প্রধান স্থান দিয়েছেন, যেমন দিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ব্রহ্মচর্যকে। শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়কেই নীতি-শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা-শিক্ষার জন্যে দায়ী হ'তে হবে।

আজকাল আমাদের দেশে শৃঙ্খলা-বোধের অত্যন্তাভাব অনেকে দেখ্ছেন। একে একটা সাময়িক তরঙ্গ-বিক্ষোভ ছাড়া অন্য কিছু মনে করা চলে না। মুক্তির আস্বাদ প্রথমে পেলে এ রকমটা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুপরিচালিত হ'লে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে আমাদের দেশে। হিট্লারের জার্মানীতে এবং গণতন্ত্রী চীনে

যুব-আন্দোলন সমবেত জন-সমষ্টির শৃঙ্খলা-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন স্পার্টার উল্লেখ এ ক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার পর ভারতবর্ষে প্রচারিত এবং অভ্যাসিত হচ্ছে বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কর্মশিক্ষার গুণ-গান করেছিলেন। তারই সুপরিকল্পিত অনুশীলন পরে সুরু হয় শ্রীনিকেতনে। এ শিক্ষা কুটীর-শিল্পের উপর নির্ভরশীল। কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে যখন শিক্ষার্থীর মনকে আয়ত্তে রেখে বিভিন্ন দিগ্-দর্শনে প্রেরিত করা হয়, তখন সেই শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে কর্মকেন্দ্রিক বলা চলে। কর্মের সাধনে এবং সমাপ্তিতে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ আছে; সেই আনন্দের আবেষ্টনে উন্মুখ মন নানাদিকে প্রধাবিত হয় এবং জ্ঞান আহরণ করে। এই জ্ঞান শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে গুঁজে দেওয়া হয় না; সে জীবনীশক্তির মত, পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানের আস্বাদ পায়। এ সম্বন্ধে দু'টি মত আছে। এক পক্ষ বলেন, এ ভাবে সঞ্চিত বা অর্জিত জ্ঞান সুপ্রচুর এবং আদর্শানুগ হয় না, কেননা বাইরের চাপ ও-তে নেই। অপর পক্ষ বলেন, ও-তে যে যে বিষয়ে মনের মধ্যে ফাঁক থাকে, তা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে পূর্ণ হয়। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ওতে মনের বনিয়াদ পাকা হয়। সেই কারণে ওকে বনিয়াদি শিক্ষা বলা হয়। সাত বছরের শিক্ষায় এই বনিয়াদ হয় দৃঢ়; তাতে আছে অনেক উপাদান—ভাষা, সাহিত্য, গণিত, সমাজ-তত্ত্ব, অর্থাৎ ইতিহাস ও ভূগোল, এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের কিছু কিছু মূল সূত্র। বনিয়াদি শিক্ষাদানের প্রণালী সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ শিক্ষক সর্বদা নূতনের আবিষ্কারে তৎপর থাকেন। কিন্তু কোটি কোটি নিরক্ষরকে

জ্ঞানের আলোকে আন্‌তে গেলে শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা কত হওয়া উচিত, তা অতি নির্বোধেও বুঝ্‌তে পারে। এখনও বনিয়াদি শিক্ষালয় সংখ্যায় অত্যন্ত মুষ্টিমেয়।

কিন্তু বর্তমান যন্ত্র-যুগে কর্ম-শিক্ষা বল্‌তে শুধু কুটীর-শিল্প বুঝায় না। দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শত রকমের যান্ত্রিক ক্রিয়া-কৌশল শিখ্‌তে হয়। তার স্তর-ভেদ আছে। স্কুলের শিক্ষার মানের তারতম্য অনুসারে যন্ত্র বা শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বে অষ্টম মানে যাদের বিদ্যাসমাপ্তি হয়, তাদের জন্যে এক প্রকার; আবার, প্রবেশিকা পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদের জন্যে ভিন্ন প্রকার কারিগরী শিক্ষার সুব্যবস্থা না হ'লে দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবে এবং অসন্তোষের আগুন জ্বল্‌তে থাক্‌বে। ভারতবর্ষের জন-শক্তি অন্য দেশের তুলনায় অসাধারণ। এই শক্তিকে বিপথে চল্‌তে দিলে রাষ্ট্রের দুর্গতি এবং শিক্ষকের অমর্যাদা।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় এ সকল প্রসঙ্গ অপরিহার্য। শিক্ষক ও শিক্ষানায়ক উভয়কেই এ সকল বিষয়ে আগ্রহশীল হ'তে হবে।
